আমাদের গল্প

বন্যা আহমেদ

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির নবম অধ্যায়।}

ধরুন, দেড় দুই লক্ষ বছর আগে কোন এক বুদ্ধিমান মহাজাগতিক প্রাণী, আমাদের কল্পনার সেই উড়ন্ত সসারে করে পৃথিবীতে পদার্পণ করলো। সেই সময়ে আফ্রিকার এক কোণে ঘুড়ে বেড়ানো আমাদের আধুনিক মানুষের প্রজাতি *Homo sapiens* দের দেখে কি ভাবতো তারা? তারা কি বিবর্তনের পরিক্রমায় এই পৃথিবীতে আমাদের টিকে থাকা নিয়ে কোন বড়সড় বাজী ধরতে রাজী হত? তারা কি ভুলেও কল্পণা করতে পারতো যে এই প্রজাতিটিই খুব নিকট ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীটাকে দখল করে নেবে? চারদিকের নির্মম প্রকৃতির সাথে টেক্কা দিয়ে টিকে থাকার জন্য কি আছে তাদের? প্রয়োজনীয় কিছুই নেই - থাবা নেই, ধারালো দাঁত নেই, শিং বা লোম কিছুই নেই, অত্যন্ত দুর্বল দেখতে অদ্ভুত এক দ্বিপদী প্রাণী! জানি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর মতই শোনাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটাকে ঠিক উড়িয়েও দেওয়া যায় না। এখন স্বভাবতই তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, সে অবস্থা থেকে আমরা টিকে গেলাম কি করে? শুধু টিকে গেছি বললেও তো ভুল বলা হবে - মাত্র দেড় দুই লাখ বছরে ফুলে ফেপে সংখ্যায় ছয়শো কোটি তো ছাড়িয়ে গেছিই, পৃথিবীব্যাপী প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছি, ইদানীংকালে আবার পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে মহাবিশ্বের দিকেও দিয়েছি হাত বাড়িয়ে। কিন্তু কি করে সম্ভব হল সেটা? বৈচিত্রময় এই বিশাল প্রকৃতি জগতের এক ক্ষুদ্র অংশ এই মানব প্রজাতির অনন্যতার উৎসটি আসলে কোথায়? দু'টি বৈশষ্ট্যের কথা তো চোখ বন্ধ করেই বলা যায়ঃ মানুষই একমাত্র প্রাণী যে দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শিখেছে, আর ওদিকে আবার খুব অসাধারণ রকমের বড় মস্তিষ্কেরও বিবর্তন ঘটেছে যা অন্য কোন প্রাণীতে ঘটতে দেখা যায় নি। হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অত্যন্ত সুপরিচিত জীববিজ্ঞানী, এডওয়ার্ড উইলসনের গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে আড়াই লাখ বছর আগে পর্যন্তও আমাদের মস্তিষ্কের আকার প্রতি এক লাখ বছরে প্রায় এক চামচের সমান করে বেড়েছিলো ১। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ধীর গতিতে হলেও এখনও আমাদের মস্তিষ্কের বিবর্ধন ঘটে চলেছে। আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশটি আমাদের বুদ্ধিমত্তার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেই সেরিব্রেল করটেক্স কে যদি টেনে ফ্ল্যাট করে বিছিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে তা চার পৃষ্ঠা জুড়ে জায়গা করে নিচ্ছে। আমাদের সবচেয়ে কাছের পূর্বসুরী শিম্পাঞ্জীদের সেরিব্রেল করটেক্স নেবে মাত্র এক পাতার সমান জায়গা, বানরেরটা নেবে একটি

পোস্টকার্ডের সমান আর ইঁদুরের ক্ষেত্রে তা নেবে মাত্র একটা স্ট্যাম্পের সমান জায়গা ২।

পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতই, তাই হয়তো সাফল্যের পাল্লাটাও বেশ ভারী। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, উহু, মস্তিষ্কের আকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সেটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়! তাহলে তো আমাদের মত বড় মস্তিষ্কের অধিকারী নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির মানুষরাও একই রকম সাফল্য অর্জন করতে পারতো - তাদের মত প্রজাতির তো তাহলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা নয়। একদিকে মস্তিষ্কের বিকাশ আবার অন্যদিকে আমাদের শরীরে সময় মত সাহায্যকারী মিউটেশনগুলোর ফলশ্রুতিতেই ঘটেছে ভাষার উৎপত্তি ও ব্যবহার, তার সাথে পাল্লা দিয়ে ঘটেছে সাংস্কৃতিক বিবর্তন এবং বিকাশ ঘটেছে জটিল এক সামাজিক ব্যবস্থার। এখানেই তো শেষ নয়, গত কয়েক লক্ষ বছরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকা পরিবেশগত পরিবর্তনের ব্যাপারটাকেও তো এই সমীকরণ থেকে বাদ দিয়ে দিলে চলবে না। এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে টিকে থাকার জন্য মানুষ যত নতুন ভাবে অভিযোজিত হয়েছে বিবর্তনের নিয়মে ততই বিকশিত হয়েছে তার নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ,

আজকে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে পূর্নাংগ কোন ধারনা পেতে হলে শুধু তার বিবর্তনের পিছনের বিজ্ঞানটা পড়লেই হবে না। বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে মানুষের চারপাশের পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশের জটিল প্রেক্ষাপটটাকেও ঠিক মত বিশ্লেষন করতে হবে।

আমরা জানি যে, এই মহাবিশ্ব প্রায় ১৪'শ কোটি বছর আগে সৃষ্টি হলেও আমাদের এই বুড়ো পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪ শ' কোটি বছর আগে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাণের জন্ম হতে লেগে গিয়েছিলো আরও প্রায় একশো কোটি বছর। আর মানুষের উৎপত্তি? সে তো সে দিনকার কথা! আদিম এক কোষী প্রাণ, ব্যকটেরিয়া, বহুকোষী প্রাণী, অ্যালজি, অমেরুদন্ডী প্রাণী, বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর উৎপত্তি, বিকাশ বা বিলুপ্তির ধাপ বেয়ে, বিবর্তনের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটলো মাত্র ৫০-৬০ লাখ বছর আগে। সে সময়ে মানুষ এবং অন্যান্য বনমানুষের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু প্রজাতিরা পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শিখলেও তার থেকে আধুনিক মানুষের পুর্বপুরুষদের উদ্ভব ঘটতে লেগে গেছে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ বছর। আর আমাদের নিজেদের প্রজাতি অর্থাৎ *Homo sapiens* দের গল্পের শুরু তো সেদিন, মাত্র দেড় লাখ খানেক বছর আগে। ভূতাত্ত্বিক নিয়মে হিসাব করলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা এক্কেবারেই আনকোরা। শুধু তো তাইই নয়, বিবর্তনের ধারায় যেমন অগুনতি জীবের উৎপত্তি ঘটেছে ঠিক তেমনি তাদের একটা বড় অংশ বিলুপ্তও হয়ে গেছে। একইভাবে আমরা ফসিল রেকর্ড থেকে দেখতে পাই যে, মানুষেরও বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, আবার আমাদের প্রজাতি ছাড়া বাকিরা বিলীন হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়। বিবর্তনের ইতিহাসে অনিয়শ্চতার তো কোন শেষ নেই, ডাইনোসরের মত অতিকায় প্রাণী বহুকাল ধরে পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেও শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ভয়ঙ্কর কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মহাপরাক্রমশালী ডায়নোসরগুলো বিলুপ্ত হয়ে না গেলে সেই সময়ের অত্যন্ত নগন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলো হয়তো এত বিকশিত হতে পারতো না। অর্থাৎ, অন্যান্য সব প্রাণীর মতই আমাদের উদ্ভবও তো কোন পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার নয়। আমরা আজকে এখানে আছি কোন 'নীল নক্সা'র ফলশ্রুতিতে নয়, বরং ঠিক তার উলটো কারণে, বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছে তা না ঘটলেই হয়তো আজকে আর আমরা এখানে থাকতাম না। প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী এবং ফসিলবিদ স্টিফেন জে.

গুল্ড তাই বলেছিলেন, 'মানুষ আগে থেকে নির্ধারিত বিবর্তনের কোন ধারার শেষ ফসল নয় বরং মানুষ হচ্ছে আকস্মিকভাবে উদ্ভুত মহাজাগতিক এক অনুচিন্তার ফলাফল। বিশাল শাখা প্রশাখাসহ যে প্রাণবৃক্ষের বিবর্তন ঘটেছে মানুষ হচ্ছে তার একটা ছোট্টো শাখামাত্র। একরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এই গাছের বীজটাকে যদি আবার নতুন করে বপন করা হয় তাহলে এই শাখাটা আবার একই রকমভাবে একই জায়গায় জন্ম নেবে না' ৩।

আসলে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসটা যে একটু অদ্ভুত এবং অন্য প্রাণীদের থেকে একটু বেশী জটিল সেটা কিন্তু স্বীকার করে নিতেই হবে! একদিক দিয়ে বিচার করলে, তা অন্যান্য সব প্রাণীর মতই প্রাকৃতিক নিয়মে বিবর্তনের ধারায় ঘটে যাওয়া এক আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়, আর অন্যদিকে থেকে চিন্তা করলে, তা হচ্ছে অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তা, ভাষা ও সভ্যতার বিকাশের এবং সেই সাথে প্রকৃতির সাথে টেক্কা দেওয়ার এক অনন্য ইতিহাস। মানুষের এই অভুতপূর্ব বুদ্ধিমত্তা একদিকে যেমন তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সামনের দিকে তেমনি তাকে উৎসাহী করে তুলেছে নিজের উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন করতে। অদম্য কৌতুহল ছিলো তার, কিন্তু জ্ঞানের মাত্রা তখনও এমন অবস্থায় পৌঁছেনি যে সে তার নিজের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে পারবে বা উপলব্ধি করতে পারবে যে, কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সে আসলে প্রকৃতির অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে তো মানুষের পক্ষে তার উৎপত্তির রহস্য বৈজ্ঞানিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিলো না। যেখানেই তার জ্ঞানের পরিসীমা আটকে গেছে সেখানেই সে জন্ম দিয়েছে হাজারো কল্পকাহিনী, উপাখ্যান আর নানা রকমের সৃষ্টিতত্ত্বের। তাই সবার মত প্রকৃতির অধীন হয়ে থেকে তার তো আর পোষালো না, সে আরও অনেক বেশী জানতে চায়, বুঝতে চায়, নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা চায়, প্রকৃতিকে জয় করতে চায়। প্রকৃতির বিশালত্ব, নির্মমতা, হিংস্রতার সামনে 'অসহায় কিন্তু বুদ্ধিমান' মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অনবরত লড়াই করেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, আবার অন্যদিকে তার সামনেই মাথা নুইয়ে তৈরি করেছে নানা ধরণের কাল্পনিক স্রষ্টার। সহজাত বুদ্ধি আর অদম্য কৌতুহল আছে তার, কিন্তু অজ্ঞতা এবং কালের সীমাবদ্ধতাও তো অপরিসীম! আসলেই তো অবাক করা ব্যাপার - চারদিকে ফুলে ফলে সম্পদে ভরা পৃথিবী, তেষ্টা মেটাতে, বেঁচে থাকতে, ফসল ফলাতে পানির দরকার, অজানা কারণে বৃষ্টি হয়ে তা ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে, তাকে তাপ দেওয়ার জন্য সূর্য উঠছে একদিকে, দিনের শেষে ডুবে যাচ্ছে আরেক দিকে - এর সবই তার জন্য তৈরি নয় তো কি? আবার ওদিকে আগুন, মহাপ্লাবন, বজ্রপাত, সাইক্লোনগুলো কি যেনো এক আজানা কারণে তাকে শাস্তি দিয়ে যাচ্ছে! মহাবিশ্বের ছোট্টো এক গ্রহের আরও ছোট্টো এই মানুষ প্রজাতি তার চারদিকের প্রকৃতি এবং মহাবিশ্বের বিশালতায় পুলকিত, অভিভুত এবং ভীত! আর তা থেকেই সে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য দেব দেবতা, অলৌকিক সব সৃষ্টিকর্তার এবং সৃষ্টিতত্ত্বের, আর তারপর মহা গর্বে, মিথ্যা আস্ফালনে নিজেকে বসিয়েছে তার কেন্দ্রে। মহাবিশ্বের সমস্ত আয়োজনের উপলক্ষ্য নাকি সে, সেই নাকি 'সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি'!

কিছুদিন আগে মিশরের এক ফেরাউনের কয়েক হাজার বছরের পুরনো সমাধি খুঁড়ে বিচিত্র সব জিনিষ পাওয়া গেছে, নরবলি দেওয়া কঙ্কাল থেকে শুরু করে ৭০ ফুট লম্বা ১৪টি নৌকার পর্যন্ত কি না পাওয়া গেছে সেই সমাধির ভিতরে! পরজন্মে রাজাদের দাস দাসী তো লাগবেই, সে জন্যই এ নরবলি; তার সাথে নৌকাগুলোও দিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যাতে চরে ফেরাউনের আত্মা পরপারে পাড়ি জমাতে পারবে! এখন হয়তো এ ধরণের কাহিনীগুলো শুনলে আমরা চমকে উঠি কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখুন - আমাদের চারপাশে পৃথিবীর আনাচে কানাচে, সব জাতি, গোষ্ঠি, সমাজ এবং সভ্যতার মধ্যেই বহু রকমের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ধর্মীয় রীতিনীতির অস্তিত্ব দেখা যায়। বহুকালের সঞ্চিত সামাজিক অভিজ্ঞতার সাথে নিজের মনের

মাধুরী মিশিয়ে আমরা তৈরি করেছি এই সৃষ্টিতত্ত্বগুলো, আর তদানিন্তন সামাজিক রীতিগুলোকে তার সাথে বেঁধে দিয়ে বলেছি এটাই নিয়ম, এটাই ধর্ম এবং একমাত্র জীবন বিধান। শুধুই যে অজ্ঞতা থেকে, ভীতি থেকেই কল্পকাহিনীগুলোর জন্ম দিয়েছে তাও কিন্তু নয়, সমাজের অধিপতিরা তাদের শাসনকে বৈধতা দেওয়ার জন্যও ভর করেছে ধর্মের উপর, একে পুঁজি করে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শোষণকে বৈধতা দিয়েছে। আর সত্যিকারের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা যেনো সাধারণ মানুষ পর্যন্ত না পৌঁছায় তার জন্য তৈরি করে রেখেছে বিভিন্ন নিয়মাবলীর। আড়াই হাজার বছর আগে সেই প্রাচীণ গ্রীস দেশে বিজ্ঞান তার সঠিক গতিতেই এগুতে শুরু করেছিলো। কিন্তু প্লেটো এবং বিশেষ করে এরিস্টোটল সেই সময়ের দাসপ্রথাভিত্তিক নিবর্তনমুলক সমাজব্যবস্থাকে গ্রহনযোগ্যতা দেওয়ার জন্য শক্তিশালী এক ভাববাদী দর্শনের জন্ম দিলেন যার মূলে ছিলো অপরিবর্তনশীলতা এবং জীবের শ্বাসত স্থায়ীত্বের তত্ত্ব [৪]। আর এই স্থবির ধারণার উপর ভর করেই রোমান সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠলো খ্রীস্টিয় ধর্ম। গত হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে শাষকচক্রের সাথে মিলে ধর্মীয় অনুশাষণগুলো কিভাবে বৈজ্ঞানিক অগ্রসরতার টুঁটি চেপে ধরেছে সেই কাহিনীতে এখন আর ঢুকছিনা, যারা মানব সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু হলেও ধারণা রাখেন তারা সবাই এ সম্পর্কে কম বা বেশী জানেন। এটুকুই শুধু বলা যায় যে, এখনও আমাদের চারপাশে এ রকম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কোন শেষ নেই। কিন্তু মানুষের ইতিহাসের আরেকটি দিক না বললে গল্পটার একটা দিক না বলাই থেকে যাবে। আমরা উপরে মানুষের কল্পনার কথা বলেছি, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিরোধের কথা বলেছি কিন্তু তার বিরুদ্ধে মানব সভ্যতার অনন্ত সংগ্রামের কথাটা এখনও বলা হয়নি। যুগে যুগে মানুষের সৃজণীশক্তি, অজানাকে জানার অদম্য কৌতুহল এবং বুদ্ধিমত্তা তাকে একদিকে যেমন কল্পণা করতে শিখিয়েছে তেমনি আবার নতুন নতুন চিন্তা এবং আবিষ্কারেরও খোরাক জুগিয়েছে। কালের পরিক্রমায় নতুন নতুন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে সে যখন অজানা বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে, তখনই সব বাঁধা অতিক্রম করে, পুরনো ভুলের এবং প্রতিরোধের দেওয়ালগুলোকে ভেঙ্গে চুড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানুষ শত অত্যাচার সহ্য করেছে, এমনকি মৃত্যকেও বরণ করে নিয়েছে। তাই আমাদের সভ্যতার ইতিহাসে এ ধরণের প্রতিরোধ এবং সংগ্রামের কাহিনীর কোন শেষ নেই। তার এই কল্পণাশক্তি এবং সেই সাথে যুক্তি দিয়ে, বস্তুবাদী চিন্তা দিয়ে তার চারদিকের সব কিছুকে বিশ্লেষণ করে দেখার অসীম ইচ্ছা এবং সর্বোপরি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার নিরন্তর সংগ্রামের কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আজকে এখানে এসে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

সে যাই হোক, চলুন আমরা ফিরে যাই মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের গল্পে। আমরা জানি যে, ষোড়শ শতাব্দীতে এসে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণাটা হাজার বছর ধরে টিকে থাকা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় এবং সামাজিক স্থবিরতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপরও তো প্রায় কয়েকশ বছর লেগে গিয়েছিল সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি কিভাবে বহু বাঁধা বিঘ্ন পেরিয়ে জীববিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে বেরিয়ে এসেছিলো সেই ‘প্রজাতির পৃথক পৃথক সৃষ্টি’ এবং স্থির প্রজাতির মতবাদের ভ্রান্তি থেকে! প্রথমাবারের মত আমরা জানতে পেরেছিলাম আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা। তারপর প্রায় দেড়শো বছর কেটে গেছে, বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো প্রতিদিনিই আরও জোরালোভাবে এই বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণ করে চলেছে, কিন্তু প্রাচীন চিন্তার আচলায়তন ভেঙ্গে আমাদের সমাজে তা কিন্তু এখনও জায়গা করে নিতে পারেনি। পৃথিবীতে যে গুটিকয়েক তত্ত্ব সমস্ত পুরনো ঘুণে ধরা রক্ষণশীল ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও প্রথাকে সমূলে আঘাত করেছে তার মধ্যে বিবর্তনবাদ অন্যতম। তাই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধেরও মাত্রাটা যে একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হবে তা তো জানা কথাই। মানব সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস জুড়েই আমরা এর পুনরাবৃত্তি দেখে এসেছি। অন্যান্য জীবের বিবর্তন নিয়ে কথা বললে যাও বা ঠিক আছে, কিন্তু মানুষের বিবর্তনের

প্রসংগ আসলেই আমাদের মাথায় যেনো আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। সেই ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড ওয়ালেস যখন প্রথম বিবর্তনের তত্ত্বটি প্রস্তাব করলেন তখন চার্চের বিশপের স্ত্রীর মুখ থেকে যে আতঙ্কবানী বের হয়ে এসেছিলো তা যেনো আজকের দিনেও প্রাসংগিক বলে মনে হয়। তিনি আর্তনাদ করে বলেছিলেন [৫],

'বনমানুষ থেকে আমাদের বিবর্তন ঘটেছে! আশা করি যেনো এটা সত্যি না হয়, আর যদি তা একান্তই সত্য হয়ে থাকে তবে চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি সাধারন মানুষ যেনো এটা কখনই জানতে না পারে! '

সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সত্যকে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা তো আর নতুন কিছুই নয়। এখনও বিশ্বব্যাপী সেই চেষ্টার যেন কোন কমতি নেই!

ডারউইন প্রথমে তার 'প্রজাতি উৎপত্তি' বইটিতে মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে তেমন কিছুই বলেন নি (শুধু বলেছিলেন, 'light will be thrown on the origin of man and his history'), এবং সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার এই নিশ্চুপতার কারণটা বোঝা তেমন কঠিনও নয়। ১৮৫৭ সালে জার্মানির ডুসেল নদীর উপত্যকায় নিয়েন্ডারথাল নামক জায়গায় বেশ কিছু আদিম মানুষের করোটি আবিষ্কৃত হয়। তখন জার্মানীর প্রখ্যাত অধ্যাপক স্কাফ হাউসেন ফসিলগুলো পর্যবেক্ষণ করে প্রস্তাব করেন যে, এগুলো আসলে মানুষের কোন বিলুপ্ত আদিম প্রজাতির হাড়গোড়। এদের নাম দেওয়া হয় নিয়েন্ডারথাল মানুষ [৬]। তখনকার শিক্ষিত সমাজ কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করেননি। ওদিকে ডারউইনের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং বিজ্ঞানী টি এইচ হাক্সলি সে সময়ই মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এপ বা বন মানুষের সাথে মানুষের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলো তুলে ধরে ১৮৬৩ সালে 'Evidence as to Man's Place in Nature' নামক বইটি প্রকাশ করেন। এর পর ডারউইন যখন "The Descent of Man and selection with respect to Sex' বইটি বের করেন ততদিনে মানুষের বিবর্তনের বিষয়টি বুদ্ধিজীবী মহলে মোটামুটিভাবে সুপরিচিত হয়ে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জার্মান বিজ্ঞানী আর্নেষ্ট হেকেল তার বিখ্যাত 'সৃষ্টির ইতিহাস' বইয়ে লিখেছিলেন যে, বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তন যদি সত্যিই ঘটে থাকে তবে মানুষও নয় আবার ঠিক বনমানুষও নয় এমন ধরণের মধ্যস্থিত ফসিল পাওয়া যাবে। তিনিই প্রথম বিবর্তনের মধ্যবর্তী অবস্থার এরকম ফসিলগুলোকে হারানো যোগসূত্র বা 'missing link' বলে আখ্যায়িত করেন [৬]। তার কথাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে - গত একশো বছরে এমন অসংখ্য ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে যা থেকে মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যবর্তী অবস্থার বিবর্তনের ধাপগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু ত তাইই নয়, এথেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন সময়ে আমাদের প্রজাতির (*Homo sapiens*) মানুষ ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রজাতির মানুষও বিচরণ করেছে, এমনকি অনেক সময় একাধিক প্রজাতির মানুষ একই সময়ে তাদের সম্মিলিত পদচারণায় মুখরিত করে তুলেছে আমাদের এই ধরণী। অর্থাৎ, আমরা নিজেদেরকে যতই বিশেষ এক 'সৃষ্টি' বলে দাবী করি না কেনো আমরাও আসলে অন্য কোন পূর্ববর্তী প্রজাতি থেকেই বিবর্তিত হয়েছি, অন্যান্য জীবের মতই আমাদের পুর্বপুরুষদেরও বিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন ধারায়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যেও উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন ধরণের প্রজাতির। এই মুহূর্তে আমরা ছাড়া আর কোন মানব প্রজাতির অস্তিত্ব না থাকলেও অতীতে যে তা ছিলো তা নিয়ে কিন্তু দ্বিমত প্রকাশের কোন অবকাশই আর নেই।

গত একশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী স্তরের যে সমস্ত ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকে মানব বিবর্তনের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া কিন্তু আর কোন কঠিণ ব্যাপার নয়। এখন সমস্যাটা

আর ‘যথেষ্ট পরিমাণে ফসিল পাওয়া যাচ্ছে না’ তা নয় বরং ঠিক তার উলটো। এত রকমের মানুষের পুর্বপুরুষের প্রজাতির এবং তাদের মধ্যবর্তী স্তরের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে যে তাদেরকে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঠিক ঠাক মত শ্রেনীবিন্যাস করাটাই বিজ্ঞানীদের জন্য এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানী আর্নেষ্ট হেকেলের মনোবাঞ্ছা যে এভাবে পূরণ হবে তা হয়তো তিনি নিজেও আশা করেননি। তার উপরে আবার গত কয়েক দশকে ডেটিং পদ্ধতির যে অভুতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে তার ফলে সঠিকভাবে ফসিলের বয়স এবং প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষমতাও বেড়ে গেছে বহুগুণ। আরও উন্নত পদ্ধতির রেডিওকার্বন ডেটিং পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে ঠিকমত আগ্নেয়শীলা পাওয়া যাচ্ছে না বা যেগুলো রেডিওকার্বন ডেটিং এর সময়সীমার আওতায় পড়ছে না সেখানে এখন ইলেকট্রন স্পিন রেসোনেন্স এবং ইউরেনিয়াম সিরিজ ডেটিং এর মত অত্যাধুনিক পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। সিটি স্ক্যান নামের ত্রিমাত্রিক এক্স-রে পদ্ধতিটি মূলত চিকিৎসাবিদ্যার জন্য আবিষ্কৃত হলেও এখন তার মাধ্যমে ফসিলের বাইরের এবং ভিতরের আভ্যন্তরীণ গঠণের ছবি তোলা সম্ভব হচ্ছে, মাইক্রোস্কপিক পদ্ধতির মাধ্যমে হাড়ের বা দাঁতের গঠন বের করে ফেলা যাচ্ছে, আবার আইসোটোপিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রজাতিগুলোর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কেও বেশ ভালো ধারণা পাওয়া যাচ্ছে [৮, ৯]।

এছাড়া মানুষ এবং এপের দৈহিক গঠনের তুলনামুলক বিচার থেকেও বহু তথ্য বেড়িয়ে এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের সাথে এপের পার্থক্যগুলো যত বেশী না পরিমাণগত তার চেয়ে অনেক বেশী গুণগত। মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রকমের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছেঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আকার- বিশেষতঃ মস্তিষ্কের আকার মানুষের অনেক বড়, বনমানুষের সাথে তাদের হাত এবং পায়ের আকারের অনুপাতেও পার্থক্য রয়েছে, গায়ের লোম পড়ে গেছে অনেকাংশেই, চামড়ার রঞ্জকবস্তু এবং বুড়ো আঙ্গুল নাড়াবার ক্ষমতাও মানুষের অনেক বেশী। আগে মানুষের সাথে বনমানুষের পার্থক্যকে যত বড় বলে মনে করা হত আধুনিক গবেষণার ফলে তা ক্রমশঃ যেন কমে আসছে। অনেকেই এখনও বৃটিশ বিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েন (Richard Owen, 1804-1892) এর বলা কিছু ভুল তথ্যকে সত্য বলে মনে করে বসে আছেন - ওয়েন মনে করেছিলেন যে, তিনি মানুষ এবং বনমানুষের মধ্যে বিশাল এক পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে মানুষ এবং বনমানুষ একই পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে আসেনি। তিনি বলেন মানুষের মস্তিষ্কে হিপোক্যাম্পাস নামের একটি বাড়তি উপাংগ রয়েছে যা কিনা বনমানুষের মধ্যে নেই। কিন্তু ডারউনের বন্ধু টি এইচ হাক্সলি তখনই তা ভুল প্রমাণ করেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষ এবং এপ দুই গ্রুপেরই মধ্যে এই উপাংগটির অস্তিত্ব রয়েছে।

এ তো গেলো একটা দিক, অন্যদিকে জেনেটিক্স এবং জিনোমিক্সের আধুনিক গবেষণা এবং পর্যালোচনাকে বাদ দিলে তো বিবর্তনের গল্প বলাই এখন আর সম্ভব নয়। গত দুই তিন দশকে বিজ্ঞানের এই শাখাটি বিবর্তনবাদ এবং মানুষের বিবর্তনের পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী সব তথ্য এবং সাক্ষ্য হাজির করেছে যার সাথে অংগস্থানবিদ্যা এবং ফসিলবিদ্যা থেকে আলাদা আলাদাভাবে পাওয়া তথ্যগুলো প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। আর দু’এক জায়গায় যেখানে অমিল বা সংশয় ধরা পড়ছে সেখানে বিজ্ঞানীরা সুযোগ পাচ্ছেন আরও নতুন নতুন গবেষণার মাধ্যমে ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার। বিজ্ঞানের তিনটি শাখা থেকে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া এই সম্মিলিত তথ্যগুলো বিবর্তনবিদ্যাকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানুষ এবং তার কাছাকাছি প্রজাতিগুলোর জিনোমের অনুক্রম বা সিকোয়েন্সিং এর মাধ্যমে আমরা মানুষের বিবর্তন

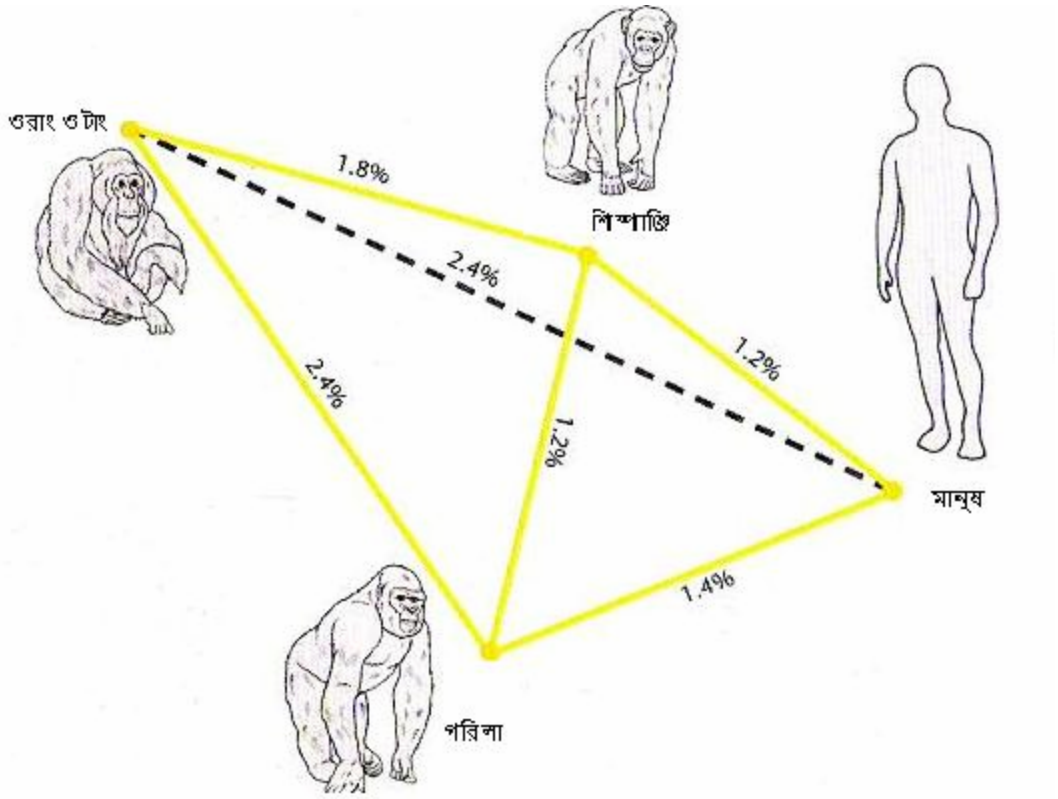

চিত্র ৯.১ : শিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং, গরিলা এবং মানুষের মধ্যে বংশগতীয় পার্থক্যের তুলনা

নিয়ে যে বিস্তারিত সব তথ্য পেতে শুরু করেছি। এখন আবার প্যালেও-অ্যন্থ্রোপলজী নামে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা তৈরি করা হয়েছে, এরা মানুষের বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করে। নৃতত্ত্ববিদ্যার অংশ হলেও এখানে জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা এমনকি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের সমস্ত গবেষণাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আসলে যতই দিন যাচ্ছে ততই আরও বেশী করে পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে মানুষের বিবর্তনকে শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের সীমার মধ্যে রেখে বিচার করলেই হবে না। বুদ্ধিমত্তা এবং ভাষার অচিন্তনীয় বিকাশের ফলে মানুষ এমন এক জটিল সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যে, বিবর্তনের প্রক্রিয়াও তার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। আবার অন্যদিকে, মানুষ ছাড়া আমাদের খুব নিকটাত্মীয়রাও, যেমন ওরাং ওটাং, গরিলা, বা শিম্পাঞ্জিও, যেহেতু বেশ জটিল সামাজিক বন্ধন তৈরি করে, তাই মানুষের বিবর্তন বুঝতে হলে এই প্রজাতিগুলোরও জেনেটিক গঠন এবং বৈশিষ্ট্য তো বুঝতে হবেই এবং তার পাশাপাশি এদের ব্যবহার এবং প্রবণতাগুলোকেও বোঝাও অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

‘মানুষের বিভিন্ন প্রজাতি’ বলতে কি বুঝায় তা আরেকবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। জীববিদ্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রজাতি বলতে আমরা বুঝি এমন এক জনপুঞ্জ যারা নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম, কিন্তু অন্য জনপুঞ্জ থেকে প্রজননের দিক থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। যেমন ধরুন, বিভিন্ন ধরণের বিড়াল প্রজাতি বললে আমরা বুঝি তার মধ্যে রয়েছে, ঘরের সাধারণ বিড়াল থেকে শুরু করে, বাঘ, চিতা বাঘ, সিংহ, জাগুয়ার, বন্য বিড়াল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতি।

হ্যা, মানুষ এবং তার পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন প্রজাতি বলতেও আমরা সেরকম ওই বিভিন্ন ধরনের মানুষের কথাই বুঝি। এখন সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের একটাই প্রজাতি টিকে রয়েছে বলে ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে ওঠা আমাদের জন্য যেনো একটু কষ্টকরে হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের প্রজাতির মানুষের সাথে কিছুটা মিল রয়েছে, আবার অমিলগুলোও চোখে পড়ার মতই, কিন্তু আবার বংশগতীয় দিক থেকে এতটাই ভিন্ন যে, তারা আমাদের সাথে প্রজননে অক্ষম –এমন বিভিন্ন ধরনের মানুষ নামক জীব পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছে? হ্যা, বেশ অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা আসলে সেরকমই।

এই বইটা তো শুরুই করেছি সেরকম এক ধরণের মানব প্রজাতির (*Homo floresiensis* বা যাদেরকে সাধারণ ভাষায় হবিট বা বেটে মানুষও বলা হয়) বর্ণনা দিয়ে। একটু পরেই আমরা আরও দেখবো যে, শুধু *Homo floresiensis* বা নিয়ান্ডারথাল প্রজাতিই নয়, বিবর্তনের ধারায় মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন রকমের প্রজাতি এবং ক্রমশঃ সময়ের সাথে সাথে আজকের আধুনিক মানুষের কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিভিন্ন ধরণের মানব প্রজাতি এই পৃথিবীতে বিকশিত হয়েছিল।

গত কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো প্রাণের বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে এক নতুন পর্যায়ে উত্তোরিত করেছে। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা না করলে একুশ শতকে বসে লেখা কোন বিবর্তনের গল্প সম্পুর্ন হতে পারেনা। তাই ভাবছি এই নতুন জ্ঞানের আলোয় আমাদের পূর্বপুরুষদের গল্পটা কি রূপ নিয়েছে তা নিয়েই না হয় আগে আলোচনা করা যাক, তারপর আমরা দেখবো ফসিল রেকর্ডগুলো তার সাথে একমত হচ্ছে কিনা। এখানে ডিএনএ র গঠন বা কিভাবে জেনেটিক তথ্য ডিএনএ র ভিতর সঞ্চিত থাকে বা আণবিক জীববিদ্যার সাম্প্রতিক সবগুলো আবিষ্কার উল্লেখ করার সুযোগ বা সময় কোনটাই নেই বলে শুধু মানুষের বিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কারের কথাই উল্লেখ করবো। আসলে সত্যি কথা বলতে কি মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে গত কয়েক শতাব্দী ধরে এত কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে যে শুধু তা নিয়েই একটি বড়সড় বই লেখা যায়। এখানে একটি অধ্যায়ের ছোট্টো পরিসরে তার সবকিছু ব্যাখ্যা করার প্রয়াসকে এক ধরণের ধৃষ্টতা ছাড়া আর কি যে বলা যায় তা ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু কি আর করা, সময় এবং সুযোগের সীমাবদ্ধতাটাকে মেনে নিয়ে আপাতত এখানেই এর কয়েকটি অংশ তুলে ধরা যাক।

জিনের আলোয় ফিরে দেখা

বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তার ‘Unweaving the Rainbow’ বইতে বলেছিলেন যে, ডিএনএ হচ্ছে ‘মৃতের জেনেটিক বই’- আমাদের পুর্বপুরুষের ইতিহাসের রোজনামচা যেন তারা। বিবর্তনবিদ্যা বলে যে, জীবের শরীরের সবকিছুই তার পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। আর এদিকে ডি এন এ র মধ্যে বিস্তারিতভাবে লেখা রয়েছে সেই কাহিনীর পূর্ণ ধারাবাহিক বিবরণী - কখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে, কোন পরিবেশে টিকে থাকার জন্য যুদ্ধ করেছে, প্রজননের ইতিহাস থেকে শুরু করে কোথায় কখন কোন মিউটেশন তাদের বিবর্তনের গতিকে নিয়ে গেছে নতুন দিগন্তে - সবকিছু লেখা আছে

আমাদের ডি এন এ র ভিতরে। প্রজননের মাধ্যমে পরের প্রজন্ম তৈরির ধারাবাহিকতা যদি ছিন্ন না হয় তাহলে ডিএনএ-এর ভিতরে লেখা তথ্যগুলো এক অণু থেকে আরেক অণুতে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রতিটি জীব তার দেহকোষের ভিতরে হাজার লক্ষ এমনকি কোটি বছর ধরে এই ঐতিহাসিক তথ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা মোটে গত কয়েক দশক ধরে আণবিক জীববিদ্যার প্রভূত অগ্রগতির ফলে সঠিকভাবে ডিএনএ -এর ভিতরে লেখা এই তথ্যগুলো পড়তে এবং বুঝতে শুরু করেছি। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স মনে করেন যে পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো বা কেউ যদি তাদেরকে কোন ম্যাজিক করে উড়িয়ে দিত তাহলেও পৃথিবী জোড়া জীবের বিস্তৃতির প্যাটার্ণ এবং তাদের জেনেটিক তথ্য থেকেই সম্পূর্ণ বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো ১১। কথাটা শুনতে অতিরঞ্জণ বা ঔদ্ধত্য বলে মনে হলেও, আজকে একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দাঁড়িয়ে, আণবিক জীববিদ্যার সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলোকে একটু মনযোগ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেই বোঝা যায় যে, কথাটা আদৌ মিথ্যা নয়।

মানুষের জিনোমের সিকোয়েন্সিং বা অনুক্রমের ঐতিহাসিক প্রথম খসড়াটি প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৩ সালে এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয় ১২। এর কিছুদিন পরেই, ২০০৫ সালে, আমাদের বিবর্তনের ইতিহাসে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শিম্পাঞ্জির জিনোমও পড়ে শেষ করা হয়। (ওদিকে আবার গত কয়েক বছরে ইঁদুর, মৌমাছি, ইষ্টসহ বেশ কয়েকটি জীবের জিনোমের অনুক্রমও বের করা হয়েছে, www.ncbi.nih.gov/Genbank বা www.genome.ucsc.edu ওয়েব সাইটগুলোতে এখন মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি সহ বিভিন্ন জীবের জিনোমের অনুক্রমের বিস্তারিত তথ্য রাখা আছে) ১৩। পৃথিবী জোড়া ৬৭ জন বিজ্ঞানী এই শিমাঞ্জি সিকোয়েন্সিং এ্যন্ড এ্যনালিসিস কনসোরটিয়ামে অংশগ্রহণ করেন, নেচার জার্নালের ২০০৫ সালের সেপটেম্বর ইস্যুতে মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোমের তুলনামুলক বিশ্লেষণের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয় ১৩। ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের(NHGRI) এর ডিরেকটর ফ্রান্সিস কলিন্স এর মতে, এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস, শারিরীক গঠন, বিভিন্ন ধরণের অসুখ বিসুখের উৎপত্তি বুঝতে হলে বিবর্তনের ধারায় উদ্ভুত এবং অত্যন্ত কাছাকাছি সম্পর্কিত বিভিন্ন জীবের জিনোমের সাথে আমাদের জিনোমের তুলনামুলক ব্যাখ্যা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের জিনোমের পরীক্ষার সাথে ফসিল রেকর্ড এবং শারীরবিদ্যার তুলনামুলক ব্যাখ্যা থেকে বিজ্ঞানীরা আগে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে যা ভেবেছিলেন তা প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। এদের বর্তমান জিনোমের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় ৯৯% এবং তাদের প্রোটিনের গঠনও খুবই কাছাকাছি। ডি এন এ র সন্নিবেশন (Insertion) এবং বিলুপ্তি (Deletion) হিসাব করলে এই সাদৃশ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৬% এ। প্রোটিন লেভেলে বিচার করলে দেখা যায় যে তাদের ২৯% জিন একই প্রোটিনের কোডিং এ নিয়োজিত। অর্থাৎ, দু'টো মানুষের ডি এন এ তুলনা করলে যে পার্থক্য দেখা যাবে, একটা মানুষ এবং শিম্পঞ্জির মধ্যে সে পার্থক্যটা মাত্র ১০ গুণ বেশী, কিংবা ধরুন ইঁদুরের সাথে মানুষের যে পার্থক্য তার তুলনায় শিম্পাঞ্জির সাথে পার্থক্য ৬০ গুণ কম ১৩! বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জিতে কিছু কিছু জিন অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় ক্রমাগতভাবে দ্রুতগতিতে বদলে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শব্দ শোনা এবং বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জিন, স্নায়ুতন্ত্রের সংকেত আদান প্রদানের জিন, শুক্রানু তেরির জিনসহ আরও কয়েকটি জিন। এদিকে আবার দেখা যাচ্ছে যে বিবর্তনের ধারায় মানুষ এবং শিম্পঞ্জির ডি এন এ তে ইঁদুর বা খরগোশের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ক্ষতিকর

মিউটেশন ঘটেছে। তার ফলে একদিকে যেমন তাদের অসুখের পরিমাণ বেড়েছে কিন্তু অন্যদিকে আবার তা তাদেরকে পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের জিনোমের এই ধরণের মিউটেশনগুলো আরও খতিয়ে দেখছেন।

> শিম্পাঞ্জি, অন্যান্য প্রাইমেট বা অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রানীর সাথে আমাদের মিলগুলো বোঝা যেমন দরকার ঠিক তেমনিভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এদের সাথে আমাদের পার্থক্যগুলো সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা। তাহলেই হয়তো আমরা বলতে পারবো কোন কোন পরিবর্তনগুলোর ফলে আমরা মানুষে বিবর্তিত হয়েছি, কিংবা ঠিক কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর কারনে আমরা তাদের থেকে বুদ্ধিমত্তায় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এত আলাদা হয়ে গেছি। ইতোমধ্যেই আমরা এই ধরনের বিশ্লেষণ থেকে এমন কিছু কিছু তথ্য জানতে পেরেছি যা আমাদের স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে।

যেমন ধরুন, দেখা যাচ্ছে যে, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের সাধারণ পূর্বসুরী থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর মানুষ Caspase- 12 নামক জিনের কার্যকরিতা হারিয়ে ফেলেছে যার ফলেই সে এখন আলজাইমারস বা স্মৃতিভংশ (Alzheimer's) রোগে আক্রান্ত হয়। এখন আমরা যদি শিম্পাঞ্জির মধ্যে এই জিনের কাজগুলোকে ঠিকমত বুঝতে পেরে আমাদের শরীরে মধ্যে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারি তাহলে হয়তো এই মারাত্মক রোগটির একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন রোগের সাথে আমাদের জেনেটিক গঠনের বিবর্তনের ইতিহাস যে কি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তা এখন ধীরে ধীরে আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

বিজ্ঞানীরা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর ক্রস পরীক্ষণ করে যত সঠিকভাবে প্রজাতির উৎপত্তি এবং বিকাশের সময়সীমা নির্ধারণ করতে পারেন ব্যাপারটা কিন্তু কয়েক দশক আগেও ঠিক এত সহজ ছিল না। ফসিল রেকর্ড পড়ার জন্য এত অত্যাধুনিক উপায়গুলো যেমন তাদের হাতে ছিল না, ঠিক তেমনিভাবে ডিএনএ বা আণবিক গঠণের তুলনামুলক বিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলোও তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আজকের দিনে ব্যাপারটা কিন্তু আর সেরকম নেই। আমরা এখন যে কোন ফসিলের আবিষ্কারকে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিভিন্ন ধরণের স্বতন্ত্র পরীক্ষা দিয়ে এক বার দু'বার নয়, বহুবারই যাচাই করে নিতে পারি। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের সময়সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটা এর এক উজ্জ্বল নমুনা। যেমন ধরুন, গত শতাব্দীর প্রথম দিকে কিন্তু মানুষের তেমন কোন মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি, অনেকেই তখন মনে করতেন যে, মানুষ হয়তো অন্যান্য বনমানুষদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো প্রায় ৫ কোটি বছর আগে। তারপর ধীরে ধীরে যখন আরও অনেক ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করলো, ওদিকে আবার বিজ্ঞানীরা মানুষের সাথে ওরাং ওটাং, গরিলা, শিম্পাঞ্জির মিলগুলো আরও ভালো করে বুঝতে শুরু করলেন তখন মনে করা হত যে, হয়তো দেড় কোটি বছর আগে মানুষের বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যেভাগে ডিএনএর আবিষ্কারের পর আমাদের সামনে আণবিক জীববিদ্যার গবেষণার দুয়ার খুলে যায়। এখন শুধু অতীতের ফসিল থেকেই নয়, আমাদের নিজেদের শরীরের জলজ্যান্ত

ডিএনএর ভিতরেই আমরা পড়ে ফেলতে পারছি আমাদের বিবর্তনের ইতিহাস। সত্তরের দশকে মানুষ এবং অন্যান্য এপদের প্রোটিনের এমাইনো এসিডের তুলনামুলক বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, বিবর্তনের যাত্রায় মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা ৫০ লক্ষ বছরের বেশী পুরনো হতে পারেনা। এদিকে আবার গত তিরিশ, চল্লিশ বছরে ফসিলবিদেরা আফ্রিকা থেকে মানুষের 'আধা' এবং 'সম্পুর্ণ' আদিপুরুষদের যে সব ফসিল খুঁজে পেয়েছেন তা থেকেও কিন্তু আমরা এখন একই ধরণের তথ্য পেতে শুরু করেছি। পরবর্তীকালে করা বিভিন্ন আণবিক গবেষণা এবং ডিএনএ সংকরায়ণের ফলাফলগুলোও এই একই সময়ের কথাই বলেছে। আর এদিকে আজকের জিনোমিক্সের অত্যাধুনিক গবেষণা থেকেও আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত জোড়ালো সাক্ষ্য পেতে শুরু করেছি। ২০০৬ সালের মে মাসে এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা নেচার জার্নালে যে গবেষণাটি প্রকাশ করেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি তাদের সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল ৫৪ লক্ষ থেকে ৬৩ লক্ষ বছর

মানুষের জিনোম : কিছু মজার তথ্য

- মানুষের জিনোমে ৪৬ টি করে ক্রোমোজোম এবং ৩ বিলিয়ন ডি এন এ বেস রয়েছে। ডি এন এর ভিতরে ৪ ধরণের বেস A, T, C এবং G রয়েছে। খুব সংক্ষপে বলতে গেলে বলতে হয়, জিন হচ্ছে এই বেসগুলোর বিভিন্ন রকমের সমন্বয়ে তৈরি ডি এন এ র অংশ যারা আমাদের শরীরের বিভিন্ন ধরণের প্রোটিনের কোড নির্ধারণ করে। ব্যাপারটা অনেকটা লিখিত ভাষার মত। কতগুলো অক্ষর দিয়ে যেমন আমরা হাজার হাজার শব্দের জন্ম দেই তেমনিভাবে এই ৪ টি বেসের সমন্বয়েই হাজার হাজার জিনের উদ্ভব ঘটে।

চিত্র ৯.২: ক্রোমোজোমের গঠন

- ডি এন এর মধ্যে উল্লেখিত তথ্যগুলোকে যদি কাগজে কলমে লেখা হয় তাহলে তা দিয়ে ২০০টা ৫০০ পৃষ্ঠার ডিকশেনারী ভরিয়ে ফেলা যাবে। এর মধ্যেই লেখা রয়েছে আমাদের কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের সব তথ্যাবলী।

- মানুষের শরীরে ১০০ ট্রিলিয়ন কোষ আছে, এবং তাদের ভিতরে যে পরিমাণ ডি এন এ রয়েছে তাদের সবগুলোকে কে পাশাপাশি করে সাজালে এখান থেকে সূর্য পর্যন্ত ৬০০ বার আসা যাওয়া করা যাবে!

- মানুষের জিনোমে ২০,০০০ - ২৫,০০০ জিন রয়েছে। দু'টো মানুষের মধ্যে ডি এন এর পার্থক্য মাত্র ০.২%, অর্থাৎ, ৫০০ টি বেসের মধ্যে মাত্র একটি তে পার্থক্য দেখা যায়। আর শিম্পাঞ্জির সাথে আমাদের জিনোমের পার্থক্য হচ্ছে ২% এর কম [১৫]।

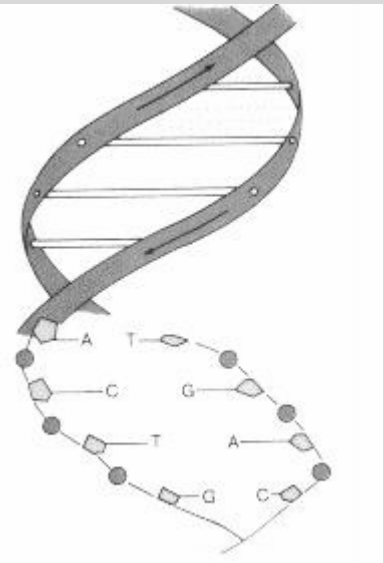

চিত্র ৯.৩: ডি এন এ র গঠন

আগে এবং তাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার ইতিহাসটি বেশ জটিল [১৪]। কিছুদিন আগেও বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে এই দুই প্রজাতির মধ্যে প্রজননে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল ৬০-৮০ লক্ষ বছর আগে, কিন্তু এখন জেনেটিক তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তা আসলে ঘটেছে আরও পরে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, সম্পূর্ণভাবে আলাদা হয়ে যাওয়ার আগে এই দুই প্রজাতি বা উপপ্রজাতির মধ্যে বেশ লম্বা সময় ধরে প্রজনন ঘটেছিল যা আমাদের ক্রোমোজোম X এর মধ্যে গভীর ছাপ ফেলে গেছে। কে জানে, এ জন্যই হয়তো আমরা এত লম্বা সময় ধরে আফ্রিকা জুড়ে 'না-এপ না-মানুষ' জাতীয় মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পাচ্ছি! পরবর্তীতে ফসিল রেকর্ড নিয়ে আলোচনার সময় আমরা এ বিষয়টি দেখতে পাবো। উপরে বলা গবেষণাটিতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, গরিলা এবং অন্যান্য প্রাইমেটদের জিনোমের গবেষণা থেকে এ বিষয়ে আরও নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যাবে এবং বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যেই তার কাজ শুরু করে দিয়েছেন[১৪]।

এবার আসা যাক আণবিক জীববিদ্যার কল্যাণে বিবর্তন তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য সংশয়ের নিষ্পত্তি কিভাবে ঘটলো সেই গল্পে। শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাং ওটাং সবার মধ্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৪৮, হঠাৎ করেই দেখা যাচ্ছে যে, একই হোমিনয়ডিয়া দলের সদস্য হওয়া স্বত্ত্বেও, মানুষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা হয়ে গেছে ৪৬। বিবর্তনের তত্ত্বানুযায়ী এরা যদি একই পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে থাকে এবং অন্যদের সবার মধ্যে ৪৮টি ক্রোমোসোমের অস্তিত্ব থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এখন প্রশ্ন করতে হবে, মানুষের জিনোম থেকে দু'টো ক্রোমোজোম কোথায় হারিয়ে গেল? বিবর্তন তত্ত্ব যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো একদিন হঠাৎ করে ক্রোমোজোম দু'টো হাওয়া হয়ে যেতে পারে না, তাদের কোন না কোন রকমের চিহ্ন থাকতেই হবে মানুষের জিনোমের মধ্যে। আর যদি এ ধরণের কোন নমুনা একেবারেই না পাওয়া যায় তাহলে তো বিবর্তনবাদের মুল বিরষয়টি নিয়েই সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। জীববিদরা প্রকল্প দিলেন যে, যেহেতু সব বনমানুষদের মধ্যে এখনও ৪৮টা ক্রোমোজোম আছে কিন্তু এদের দলের মধ্যে শুধুমাত্র মানুষেরই দু'টো ক্রোমোজোম কম আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, শেষ সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বিবর্তনের পথে চলতে চলতে কোন এক সময়ে মানুষের প্রজাতির মধ্যে আদি দু'টো ক্রোমোজোম সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল, যা অন্যান্য বনমানুষদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। শেষ পর্যন্ত, এই তো কিছুদিন আগে, ২০০২ সালে বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে, আসলে শিম্পাঞ্জিদের যে ১২ এবং ১৩ নম্বর ক্রোমোজোম (এখন তাদেরকে ২A এবং ২B বলে নামকরণ করা হয়েছে, নীচের ছবিতে মানুষের ক্রোমোজোম ২ এর সাথে শিম্পাঞ্জি, গরিলা এবং ওরাং ওটাং এর এই দুইটি ক্রোমোসোমের তুলনা দেখানো হয়েছে) রয়েছে সে দু'টো মানুষের মধ্যে মুখোমুখীভাবে সংযুক্ত হয়ে ক্রোমোজোম ২ তৈরি করেছে[১৬]। এই দু'টো ক্রোমোজোমের সংযুক্তির বিন্দুটির গঠন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা থেকেও মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের আরও অনেক তথ্য বের হয়ে এসেছে, কিন্তু তা নিয়ে এখানে আর আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। আসলে এ ধরণের ক্ষেত্রগুলোতেই আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তনবাদের শক্তি এবং সঠিকতা বুঝতে পারি। কোন সঠিক তত্ত্ব থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প বা পূর্বাভাস দেওয়া

চিত্রঃ ৯.৪: শিম্পাঞ্জি (C), গরিলা (G), ওরাং ওটাং (O) এবং মানুষের (H) ক্রোমোজোম ২এর তুলনামুলক গঠন

(Yunis, J. J., Prakash, O., The origin of man, a chormosomal pictorial legacy. Science, Vol 215, 19 March 1982. 1525 - 1530)

সম্ভব হয় যা অবৈজ্ঞানিক কোন কিছুর উপর ভিত্তি করে দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরুন, মানুষের শরীরে কোনভাবেই এই হারিয়ে যাওয়া ক্রোমোজোম টির অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যেত তাহলে বিবর্তন তত্ত্বের সঠিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হতেন বিজ্ঞানীমহল।

এছাড়াও মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির জিনোম বিশ্লেষণ থেকে বিজ্ঞানীরা মানুষের মস্তিষ্কের অত্যন্ত দ্রুত বিকাশের জন্য দায়ী জিনগুলো, তাদের বিকাশের সময়সীমা, বিভিন্ন ধরণের প্রোটিনের গঠন, বনমানুষদের মধ্যে ঘ্রাণশক্তির লোপ এবং সেই সাথে সাথে শক্তিশালী দৃষ্টিশক্তির বিকাশের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য পেতে শুরু করেছেন। এমআইটি এবং হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির ব্রড ইনস্টিটিউটের সদস্য বিজ্ঞানী টি মিকেলসনের মতে, আগামী কয়েক বছরে আরও অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং প্রাইমেটের জিনোমের অনুক্রম বের করে ফেলা যাবে, সেখান থেকে খুব সহজেই মানুষের বিবর্তনের জন্য দায়ী বিশেষ ডিএনএর অনুক্রমগুলো বেড়িয়ে পড়বে। মানুষের বিবর্তনের প্রধান

বৈশিষ্ট্যগুলো, যেমন ধরুন, দুই পায়ের উপড় ভর করে দাঁড়াতে পারা, মস্তিষ্কের বিবর্ধন বা জটিল ভাষাগত দক্ষতার মত বিবর্তনের বিশেষ ধাপগুলোতে কি ধরণের জেনেটিক পরিবর্তন কাজ করেছিল সেগুলো আবিষ্কার করতে পারলে হয়তো আমরা মানুষের বিবর্তনের একটা সম্পুর্ণ রূপরেখা তৈরি করতে পারবো ১৩। আবার অন্য দিকে এই জেনেটিক পরিবর্তনগুলো তাদেরকে টিকে থাকার জন্য কি বিশেষ ধরণের সুবিধা করে দিয়েছিল - এগুলো কি তাদের পরিবর্তনশীল পরিবেশে সাথে খাপ খাইয়ে নিতে বাড়তি সুবিধা করে দিয়েছিল নাকি দ্রুত চলাচলে বা পারস্পরিক সংযোগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল, নাকি সামাজিকভাবে দলবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার ক্ষমতা যুগিয়েছিল - এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে রয়েছে আমাদের উৎপত্তি এবং বিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসের রহস্য। আর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লুকিয়ে রয়েছে আমাদেরই দেহকোষের ভিতরের্ ডিএনএ মধ্যে। এই 'জিনের আলোয় ফিরে দেখা' পর্বটা শুরু করেছিলাম রিচার্ড ডকিন্সের উক্তি দিয়ে, চলুন তার আরেকটা উক্তি দিয়েই এর পরিসমাপ্তি ঘটানো যাক। তিনি ঠিকই বলেছেন, 'আমরা এই পৃথিবীতে ক্ষণিকের অতিথি, আমাদের জীবনের কাজ যখন শেষ হয়ে যায় তখন আমাদের দেহটাও পৃথিবীর বুকে বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু জিনগুলো হচ্ছে আবহমানকালের নাগরিক, তারা চিরঞ্জীব। তাদের মধ্যেই লেখা আছে আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশের সব কাহিনী'।'

ফসিল রেকর্ডের আলোয় এবার আমাদের ইতিহাসটা ঝালিয়ে নেওয়া যাক

চলুন এবার চোখ ফেরানো যাক বিবর্তনের সুদুর ইতিহাসের পাতায় - প্রায় ৬০ লক্ষ বছর আগের ইতিহাসে, যখন অন্যান্য বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তনের পথ আলাদা হয়ে যেতে শুরু করেছিলো। আগের অধ্যায়গুলোতেই দেখেছিলাম ফসিল রেকর্ডগুলো কিভাবে জীবের বিবর্তনের ইতিহাসের পদচিহ্ন বহ্ন করে চলেছে। ডঃ রিচার্ড ডকিন্স যেমন একদিকে বলেছেন যে, কোন ফসিল রেকর্ডগুলো না থাকলেও আমরা শুধু জেনেটিক তথ্য থেকেই বিবর্তনের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখতে পারতাম, ঠিক তেমনিভাবে এও বলেছেন যে, আমাদের হাতের সামনে আর কোন সাক্ষ্য না থেকে শুধুই যদি ফসিল রেকর্ডগুলো থাকত তাহলেও আমরা একইভাবে চোখ বন্ধ করে বিবর্তনবাদের সঠিকতা প্রমাণ করতে পারতাম। এটা আসলে আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা 'একে অপরের পরিপুরক' হিসেবে বিবেচিত দু'টো পথ এক সাথে খুঁজে পেয়েছি ১১।

আসলে মানুষের বিবর্তনের গল্পটা পুরোপুরি বলতে গেলে আমাদের শুরু করতে হবে মানুষ নামক কোন প্রাণীর উদ্ভবেরও অনেক আগে - তাদের সেই আদি পুর্বপুরুষ বানর এবং পরবর্তী পূর্বপুরুষ বনমানুষদের বিবর্তনের ইতিহাস থেকে। এই দীর্ঘ ইতিহাসের বইটির অনেক হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু গত একশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী স্তরের এমন অনেক ফসিল খুঁজে পেয়েছেন যা থেকে মানব বিবর্তনের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া কিন্তু আর কোন কঠিণ ব্যাপার নয়।

ফসিল রেকর্ডের প্রসঙ্গে ঢোকার আগে পাঠকদেরকে একটা বিষয়ে আগে থেকেই সাবধান করে দিতে চাই। এই বইটি লেখার সময় সবচেয়ে বড় ভাবনা ছিল কিভাবে কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা না কপচিয়ে সহজ ভাষায় বিবর্তন সম্পর্কে লিখতে পারা যায়। কতটুকু সফল হয়েছি জানি না, সেই বিচারের ভার না হয় পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি, তবে এখানে এসে যে বিপদে পড়ে গেছি তা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারছি। ফসিল রেকর্ডের ধারাবাহিক বিবরণ দিতে গেলে সেই প্রতিজ্ঞাটি আর রাখা সম্ভব কিনা তা ঠিক বুঝতে পারছিনা। এখানে বারবারই ইতিহাসের সময়সীমা, প্রজাতিদেরর বৈজ্ঞানিক সব দুর্বোধ্য নাম,

এই বইয়ে মানুষ , এপসহ প্রাইমেটদের জন্য যে শ্রেণীবিন্যাস ব্যবহার করা হয়েছেঃ

মানব প্রজাতিসহ সব বনমানুষই স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্তর্গত প্রাইমেট বর্গের মধ্যে পড়েছে। এই **প্রাইমেটদের** মধ্যে এখন পর্যন্ত জানা মতে দুই শ'রও বেশী প্রজাতি রয়েছে, এখনকার আধুনিক শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী এদেরকে তিনটি উপবর্গে ভাগ করা হয়ঃ **প্রোসিমিই** (যার মধ্যে রয়েছে লেমুর, লরিস, বুশবেবি জাতীয় আদি প্রাইমেট); **টারসিফরম** (টারশিয়ারদের আগে প্রোসিমিইর মধ্যে ফেলা হলেও এখন তাদেরকে আলাদা উপবর্গে ফেলা হয়); এবং **অ্যানথ্রোপইডি** (সব ধরণের বানর, বনমানুষ এবং মানুষ)। অ্যানথ্রোপইডি জাতীয় প্রাইমেটদেরকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ **নতুন দুনিয়ার বানর** (New World Monkeys বা Platyrrhini) এবং **পুরানো দুনিয়ার বানর** (Old World Monkeys বা Catarrhini)| হাউলার বা স্পাইডার বানর জাতীয় নতুন দুনিয়ার বানররা লেজ দিয়ে গাছে ঝুলে থাকতে পারে; আর ওদিকে ম্যাকাকু, বেবুন এবং হোমিনয়ডিয়া জাতীয় পুরানো দুনিয়ার বানররা লেজ দিয়ে গাছে ঝুলে থাকতে পারে না। আগে বিজ্ঞানীরা হোমিনিড গ্রুপের মধ্যে শুধু আধুনিক মানুষ এবং তাদের দ্বিপদী পুর্বপুরুষদের ফেলতেন, আর গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং অন্যান্য বনমানুষদের এক সাথে করে অন্য গ্রুপে ফেলা হত। কিন্তু আধুনিক জেনেটিক পরীক্ষা থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, শিমাঞ্জিরা জেনেটিকভাবে গরিলা বা অন্যান্য বনমানুষের চেয়ে মানুষের অনেক কাছের প্রজাতি। তাদেরকে গরিলা বা ওরাং ওটাংদের সাথে এক করে শ্রেণীবিন্যাস করার কোন মানে হয় না। এখানে আমি আজকালকার বেশীরভাগ আধুনিক প্যালেও-অ্যন্থ্রোপলজীর বইয়ে ব্যবহৃত শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিই ব্যবহার করবো। এখানে মানুষসহ সব বনমানুষদের প্রথমে **হোমিনয়ডিয়া (বা এপ)** সুপার ফ্যামিলি বা অধি-গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তারপর গিবনদেরকে আলাদা করে দিয়ে বাকিদেরকে ফেলা হয়েছে **হোমিনিডি** গোত্রে। এই গোত্রে রয়েছে তিনটি উপ-গোত্রঃ ক) **ওরাং ওটাং,** খ) **গরিলা** এবং গ) **শিম্পাঞ্জি ও মানুষ**। মানুষ এবং শিম্পাঞ্জির উপগোত্রকে বলা হয় **হোমিনিনি**। আমি এই বইয়ে সাধারণভাবে মানুষসহ হোমিনিডিয়া ফ্যামিলির সব বনমানুষ বা এপকে 'বনমানুষ' বলে অভিহিত করেছি [৮]ঃ

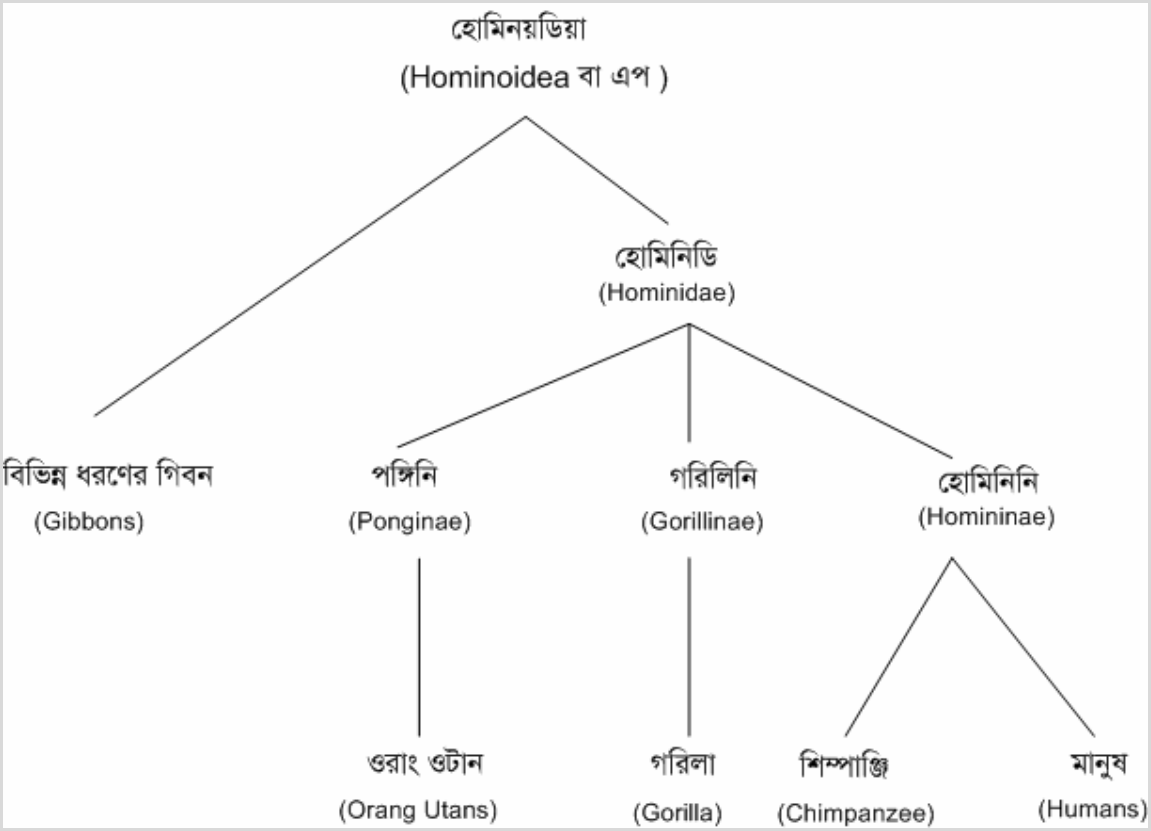

চিত্রঃ ৯.৫: হোমিনয়ডিয়া সুপার ফ্যামিলির সদস্যের শ্রেণীবিন্যাস

শ্রেনীবিন্যাস, গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের মত অত্যন্ত শুষ্ক এবং একঘেয়ে বিষয়গুলো চলে আসবে। এগুলোকে বাদ দিয়ে, কিন্তু আবার ওদিকে বৈজ্ঞানিক সততাও বজায় রেখে সঠিকভাবে বিষয়টা উপস্থাপন করা আসলে বেশ শক্ত একটা কাজ। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো সহজ সরল ভাষায় লিখতে, আশা করি উৎসাহী পাঠকেরা একটু কষ্ট করে হলেও ধৈর্য বজায় রাখতে সক্ষম হবেন।

আদি পুর্বপুরুষ প্রাইমেটদের বিবর্তনঃ আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছিলাম যে, প্রায় ২০ কোটি বছর আগে সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীবের বিবর্তন ঘটেছিল বটে, তবে সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে পর্যন্ত তাদের তেমন কোন বিশেষ বিকাশ বা বিস্তৃতি দেখা যায়নি। তার পরের প্রায় ১০ কোটি বছর ধরে বিভিন্ন ধরণের 'সরীসৃপ জাতীয় স্তন্যপায়ী' বা 'স্তন্যপায়ী জাতীয় সরীসৃপ' প্রাণীর অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পাওয়া যায়। সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে ডায়নোসররা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ারও বেশ পরে ইওসিন যুগে আদি প্রাইমেটদের বিবর্তন ঘটে। সেই সময়েই পৃথিবীর জলবায়ু আবারও গরম হয়ে উঠতে শুরু করে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। অনেকেই মনে করেন এই গরম আবহাওয়া অরন্যচারী প্রাইমেটদের বিকাশে সহায়তা করেছিল। আদি প্রাইমেটদের বেশ কয়েকটি প্রজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে (অষ্ট্রেলিয়া এবং অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ দু'টো বাদ দিয়ে) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই যুগেই অ্যাডাপিডি (family: Adapidae) এবং টারসিফরম (Tarsiiformes) জাতীয় প্রাণীর অনেক ফসিল পাওয়া গেছে যাদের মধ্যে প্রাইমেটদের মোটামুটি সব বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল [৮]।

প্রাইমেটদের কারা?

প্রাইমেটদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চেয়ে বেশ অগ্রসর ধরণের [৬]। তাদের মধ্যে গাছে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় অভিযোজন ক্ষমতাটি এখানে উল্লেখযোগ্যঃ তাদের হাত পা গাছে গাছে চলেফিরে বেড়াবার জন্য অত্যন্ত উপযোগী, আঙ্গুলগুলো কমবেশী নাড়াতেও পারে, বুড়ো আঙ্গুলকে অন্যান্য আঙ্গুলের বিপরীতে নিতে পারে, নখরের পরিবর্তে বিকাশ ঘটেছে নখের এবং সেই সাথে রয়েছে সংবেদনশীল হাতের তালু। তারা পা ,হাত এবং আঙ্গুল দিয়ে যেমন গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে পারে, তেমনি আবার হাত দিয়ে যে কোন জিনিষ বা খাদ্য মুখেও তুলতে পারে, বাহু ঘুরাতে পারে। চলাফেরার সময় পিছনের পা প্রধান ভুমিকা পালন করে যার ফলে দেখা যায় তাদের অনেকেই অর্ধ-খাড়া বা প্রায় খাড়া হয়ে দাঁড়াবার (এদের মধ্যে শুধু মানুষই পুরোপুরিভাবে দ্বিপদী) ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাদের চোখ দু'টো আপেক্ষাকৃতভাবে কাছাকাছি, দেখার সময় দর্শন ক্ষেত্রের অধিক্রমণ (Overlap) করতে পারে বলে তাদের দৃষ্টিশক্তি ত্রিমাত্রিক, যা দিয়ে তারা খাদ্য এবং গাছের ডালপালার মধ্যে ব্যবধাণ খুব ভালোভাবে নির্ণয় করতে পারে। প্রাইমেটদের মধ্যে সবধরণের খাবারের উপযোগী দাঁত এবং পরিপাকযন্ত্র বিকাশ লাভ করে। তাদের দেহের আকারের তুলনায় মস্তিষ্কের আকার অনেক বড় এবং জটিল, এবং তারা বেশ জটিল সামাজিক জীবন যাপন করতে সক্ষম [৬]।

এপ বা বনমানুষদের বিবর্তনঃ প্রায় ৪ কোটি বছর আগে, ইওসিন যুগের শেষ দিকে, আবার বেশ ঠান্ডা পড়তে শুরু করে, ক্রমশঃ জঙ্গলের বিস্তৃতি কমে যেতে থাকে। সেই সাথে সাথে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের, বিশেষ করে প্রাইমেটদের, বিবর্তনের ধারায়ও পরিবর্তন দেখা দেয়। ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, এ সময় তাদের বেশীর ভাগ প্রজাতিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে ওদিকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি বছর আগে মিশরসহ উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বেশ কয়েক ধরণের আদি অ্যানথ্রোপয়েড জাতীয় প্রাইমেটের বিস্তৃতি ঘটতে দেখা যায়। ফসিল রেকর্ডে বিভিন্ন প্রজাতির বানর এবং বনমানুষ উভয়ের অস্তিত্ব দেখে মনে হয় যে, ইতোমধ্যেই বনমানুষের বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। আসলে এই সময়ে এত ধরণের

বনমানুষ বা এপ কারা?

বনমানুষেরা প্রাইমেট বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। হোমিনয়ডিয়া বা মানুষসহ সব ধরণের বনমানুষের মধ্যে দু'টো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ এই অধিগোত্রের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রাণীর মধ্যেই আর লেজ দেখতে পাওয়া যায় না এবং তাদের হাতের কনুই এর জয়েন্টে বিশেষ এক ধরণের গঠন বিকাশ লাভ করেছে। এই অংশটির বিশেষ গঠনের কারণেই আমরা এত সহজে হাত বাঁকাতে বা নোয়াতে পারি, হাতের উপর ভর করে ঝুলে থাকতে পারি। এই ধরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর নির্ভর করেই বিজ্ঞানীরা অন্যান্য প্রাইমেটদের ফসিল থেকে বনমানুষের পূর্বপুরুষের ফসিলের পার্থক্য নির্ধারণ করেন।

বানর, বনমানুষ এবং 'না বানর এবং না বনমানুষের' মধ্যবর্তী ফসিল পাওয়া গেছে যে বিজ্ঞানীরা কাকে বানর বলবেন আর কাকে বনমানুষের জাতে ফেলবেন তা নিয়ে রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত আদি প্রাইমেটদেরও লেজ ছিল, বনমানুষের পূর্বপুরুষদের মধ্যেই প্রথম লেজের বিলুপ্তি ঘটে। এ সময়েই বোধ হয় তাদের খাদ্যাভ্যাসেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে, তাদের বেশীরভাগই গাছের পাতা খাওয়া ছেড়ে ফলমুল খাওয়ার অভ্যাসে অভিযোজিত হয়ে যায় [৮]। আফ্রিকায় বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েক প্রজাতির 'না বানর না বনমানুষ'

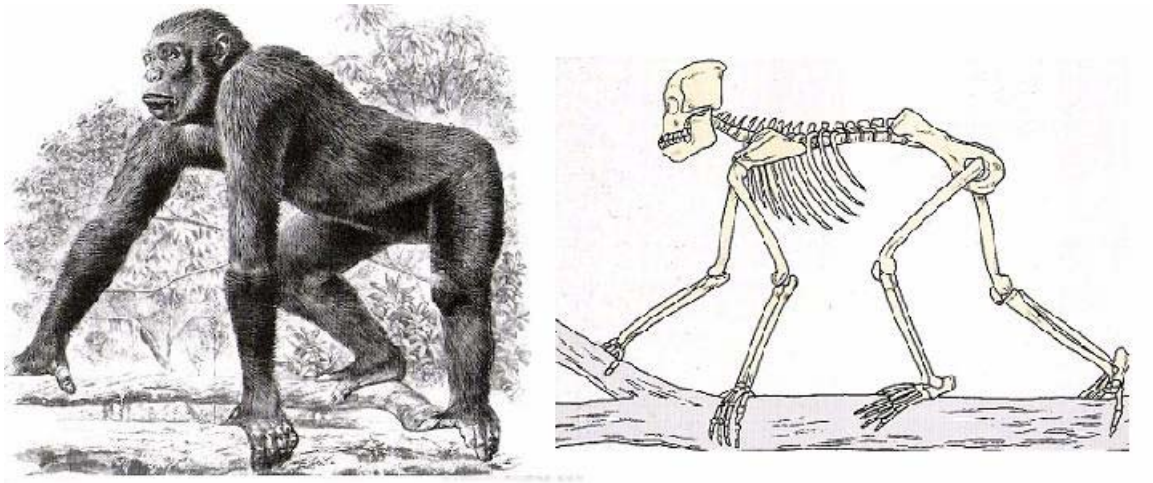

চিত্রঃ ৯.৬: বিজ্ঞানীরা এখন মোটামুটিভাবে প্রোকনসুলের বেশীরভাগ হাড়ের ফসিলেরই সন্ধান পেয়েছেন। সেখান থেকেই উপরে প্রোকনসুলের কঙ্কাল এবং শারীরিক গঠণের ছবি আঁকা হয়েছে [৮]।

জাতীয় প্রোকনসুলের*(Proconsul)* প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে। এরা গাছে গাছে থাকতো, বানরের মত এদের নমনীয় মেরুদন্ড এবং সংকীর্ন বুকের গড়ণ থাকলেও নাড়াচাড়ার দিক থেকে তাদের বুড়ো আঙ্গুল এবং কোমড় বনমানুষদের মতই ছিল [১০]। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এরাই হোমিনয়ডিয়া বা সব বনমানুষদের পূর্বপুরুষ।

এ সময়ের দিকেই বেশ কিছু মজার ব্যাপার ঘটতে শুরু করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা মহাদেশীয় সঞ্চরণের কথা শুনেছি, এও দেখেছি যে এর সাথে প্রাণের বিবর্তনের প্যাটার্নের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আগে আফ্রিকা ইউরেশিয়া থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিল কিন্তু ১.৭ কোটি বছর আগে প্রথম আফ্রিকা মহাদেশের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের একটা সংকীর্ণ সংযোগ স্থাপিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে ভুমি সংযাগটা বেশ প্রশস্থ হলে প্রথমবারের মত পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপে আফ্রিকা থেকে ইঁদুর, এ্যন্টিলোপ এবং প্রাইমেটসহ বিভিন্ন

প্রাণীর আগমন ঘটতে শুরু করে। জার্মানী, টারকী, চেক প্রজাতন্ত্রের মত বিভিন্ন দেশে এ সময়েই প্রথম বনমানুষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় [৮]।

বিভিন্ন ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, সেই ১.৯ কোটি বছর আগে প্রোকনসুল জাতীয় বনমানুষের সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে গিবনদের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু ওরাং ওটাংদের বিবর্তন ঘটে বেশ পরের দিকে, ১.৬ কোটি বছর আগে *Sivapithekas* জাতীয় বনমানুষের প্রজাতি থেকে। এদের ফসিলের গঠন থেকে বোঝা যায় যে এরা বেশ কিছুটা সময় মাটিতে কাটাতো, হাত পায়ের হাড়ের গড়নে মাটিতে অভিযোজনেরও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। *Sivapithecus* এর আগের বনমানুষদের মধ্যে বানরের অনেক

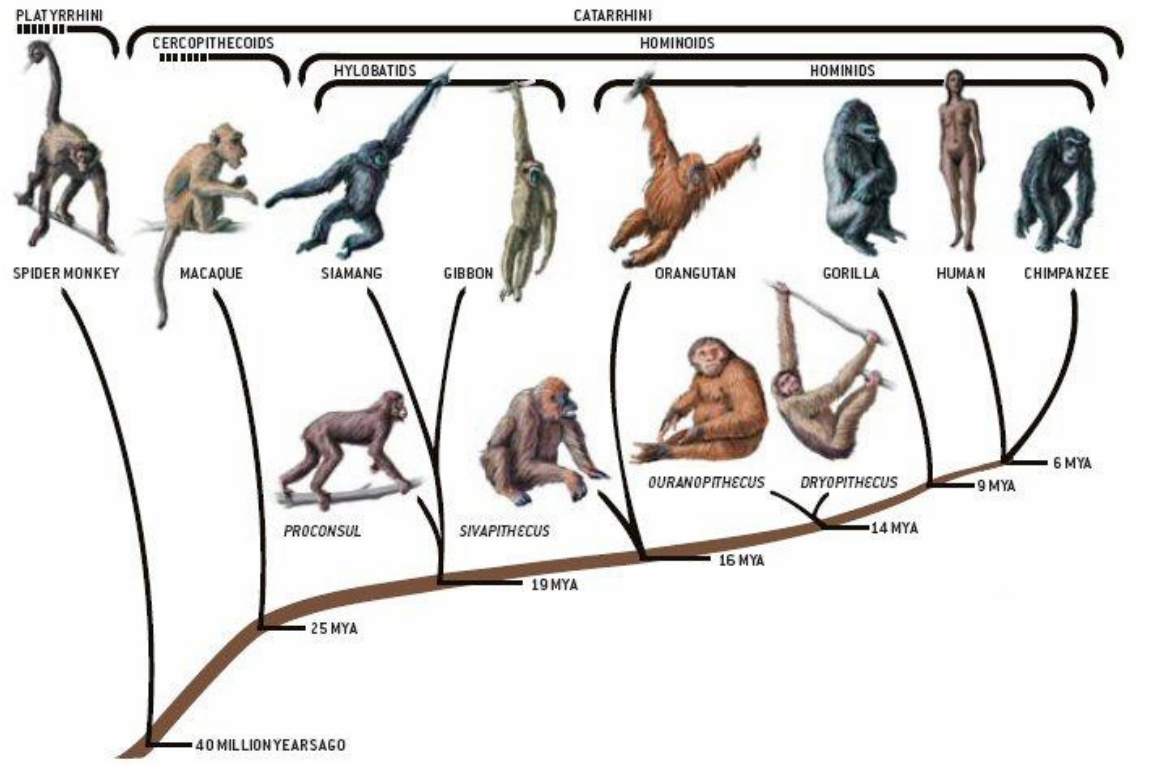

চিত্রঃ ৯.৭: মিওসিন যুগের বেশীরভাগ এপই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিজ্ঞানীরা এই যুগের আদি আদি প্রাইমেট প্রোকনসুল (Proconsul) প্রজাতিকে এখন হমিনয়েডদের সাধারণ পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন। ফসিল রেকর্ডে এদের মোটামুটি সব হাড়েরই সন্ধান পাওয়া গেছে। সিভাপিথেকাস্কে ওরাং ওটাংদের পুর্বপুরুষ এবং ড্রাইওপিথেকাস বা ওরানোপিথেকাসকে হোমিনিডি অর্থাৎ মানুষ এবং বনমানুষের পুর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়।

বৈশিষ্ট্যের মিশাল পাওয়া যায়, কিন্তু এর উত্তরসুরীদের মধ্যে তা ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে এবং এরাই যে হমিনয়ড লাইনেরই পূর্বসুরী তাতে কোন সন্দেহ নেই [৮]। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ১.৪-১.২ কোটি বছর আগের *Ouranopithecus* কিংবা *Dryopithecus* জাতীয় কোন বনমানুষরাই হমিনয়ডিয়া সুপার ফ্যামিলির পূর্বপুরুষ। এদের কোন এক প্রজাতি থেকেই প্রায় ৯০ লক্ষ বছর আগে গরিলাদের বিবর্তন ঘটে। আর তারও বেশ পরে প্রায় ৬০ লক্ষ বছর আগে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষ তাদের সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে নিজ নিজ পথে বিবর্তিত হতে শুরু করে। আর এখান থেকেই শুরু হয় আমাদের পূর্বপুরুষদের নিজস্ব যাত্রা, দীর্ঘ আকাবাঁকা বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আজকের মানুষে বিবর্তিত হওয়ার সেই মহাযাত্রা।

এ তো গেল আমাদের সেই আদিতম পুর্বপুরুষের কাহিনী, এখন আমরা প্রায় মানুষের আদি পুর্বপুরুষদের বিবর্তনের ইতিহাসের পাতায় এসে পড়েছি, সেই গল্পে ঢোকার আগে আমাদের নিকটতম আত্মীয় শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে একটা সাধারণ ভুল ধারণা সম্পর্কে দু'একটা কথা বলে নিলে বোধ হয় খারাপ হয় না। আমরা প্রায়ই অনেককে বলতে শুনি যে, শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে, ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক সেরকম নয়।

> প্রায় ৬০-৭০ লক্ষ বছর আগে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের পুর্বপুরুষেরা এক ছিল, তারপর তাদের সেই সাধারন পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে দু'টো ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে - এরই এক ধারা থেকে ঘটে মানুষের বিবর্তন আর অন্য ধারা থেকে উদ্ভব ঘটেছে শিম্পাঞ্জীদের। শিম্পাঞ্জির সাথে আমাদের সম্পর্কটা আসলে অনেকটা খালাতো ভাইবোনের মত, নানা নানি এক হলেও আমরা সরাসরি কেউ কারও পুর্বপুরুষ নই।

বিবর্তনীয় সম্পর্কের হিসেবে অংক কষলে দেখা যাবে যে, আমাদের সাথে শিম্পাঞ্জির সম্পর্কটা সবচেয়ে কাছের, তারপরে আমাদের নিকট আত্মীয় হচ্ছে গরিলা। আর ওরাং ওটাংরা যেহেতু গরিলাদেরও আগে আমাদের সবার সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কটাও আরেকটু দুরের। আগেই দেখেছিলাম যে জেনেটিক দিক থেকে আমাদের সাথে শিম্পাজির মিল প্রায় ৯৯%, উপরে চিত্র ৯.১ এ শিম্পাঞ্জিসহ আমাদের অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের মধ্যে জেনেটিক পার্থক্যের তুলনাগুলো দেখানো হয়েছে।

এরাই কি আমাদের আদি পুর্বপুরুষ?

আমরা আগেই দেখেছি আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের পরীক্ষাগুলো বলছে যে ৫০-৬০ লক্ষ বছরের কাছাকাছি কোন সময়ে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের পূর্বপুরুষেরা আলাদা হয়ে যায়, এই তথ্যের সাথে এখন পর্যন্ত পাওয়া ফসিল রেকর্ডগুলোও কিন্তু প্রায় মিলে যাচ্ছে। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ৬০-৮০ লক্ষ বছরের পুরনো কয়েকটি ফসিলের অংশ বিশেষ (তাদের মধ্যে রয়েছে কেনিয়া থেকে পাওয়া *Orrarin tugenensis,* ইথিওপিয়া থেকে পাওয়া *Ardipithecus ramidus,* চাদ থেকে পাওয়া *Sahelanthropus tchadensis,* ইত্যাদি) পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানীরা এখনও এদেরকে মানুষের সবচেয়ে পুরোনো পূর্বপুরুষের ফসিল বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। কারণ তাদের মতে, কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর মত পর্যাপ্ত পরিমাণ সাক্ষ্য প্রমাণ নাকি এখনও পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ফসিল রেকর্ডগুলো থেকে আমরা কি এখন পর্যন্ত কি জানতে পেরেছি? আসলে গত কয়েক দশকে এত রকমের মানুষের পূর্বপুরুষের প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে যে, আমাদের চোখের সামনে মানব বিবর্তনের ছবিটা দিন দিন বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। প্রায় ৪১ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় মানুষ এবং এপের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রজাতি *Australopethicus anamensis* (*Australopethicus* এর অর্থ হচ্ছে দক্ষিণের এপ) এর অস্তিত্ব ছিল। আসলে এই কথাটা বলার সাথে সাথেই উৎসাহী পাঠকের মনে এক ঝাক প্রশ্নের উদয় হওয়াটাই কিন্তু স্বাভাবিক। এরা কি আমাদের সরাসরি পুর্বপুরুষ ছিল? মানুষের পূর্বপুরুষ হতে হলে কোন প্রজাতির কি কি ধরণের বৈশিষ্ট্য থাকতে

হবে? এদেরকে সরাসরি মানুষের পূর্বপুরুষ না বলে মধ্যবর্তী ফসিলই বা বলা হচ্ছে কেন? চলুন দেখা যাক এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে বিজ্ঞানীরা কি বলছেন।

দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ানোর ক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে সব বিজ্ঞানী এখন মানুষের আদি পূর্বপুরুষদের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিয়েছেন। অনেকে বড় মস্তিষ্কের কথাও বলেন। কিন্তু আসলে বিবর্তনের ধারায় দেখা যায় যে, দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়ানোরও বেশ অনেক পরে, মাত্র ২০ লক্ষ বছর আগে, আমাদের পূর্বপুরুষদের মস্তিষ্ক বড় হতে শুরু করেছিল। তাই এখন মস্তিষ্কের আকারকে মানুষের আদিতম পুর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য হিসেবে না ধরে বরং অপেক্ষাকৃত আধুনিক মানুষের (যাদেরকে *Homo* গণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়) পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই ধরা হয়। এখন পর্যন্ত পাওয়া ফসিল রেকর্ড থেকে আমরা যে সব আদি পুর্বপুরুষ প্রজাতিদের কথা সবচেয়ে ভালোভাবে জানতে পেরেছি তাদের মধ্যে *Australopethicus afarensis* (যার অর্থ দাঁড়ায়, আফার অঞ্চল থেকে পাওয়া দক্ষিণের এপ) এর কথাই প্রথমে বলতে হয়। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে ইথিওপিয়া ও তানজেনিয়ার বিভিন্ন

চিত্র ৯.৮: পাশের ফসিল থেকে ধারণা করা লুসির কল্পিত ছবি

চিত্র ৯.৯: ইথিপিয়ার হাদার অঞ্চলে পাওয়া লুসির কঙ্কালের ফসিল।

জায়গায় *A. afarensis* প্রজাতির আংশিক ফসিল পাওয়া যায়, এর মধ্যে ছিল হাটুর জোড়া এবং পায়ের হাড়ের উপরের অংশ। এখান থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে শুরু করেন যে এরা দুই পায়ের উপর ভর করে হাটতে পারতো। এর পরবর্তী পাঁচ বছরে আরও অনেক ফসিল খুঁজে পাওয়া গেলেও আসল চমকটির সন্ধান কিন্তু তখনও বিজ্ঞানীরা খুঁজে পাননি। আর সেটি হল প্রায় ৩২ লক্ষ বছর বয়সের বিখ্যাত সেই কঙ্কাল - যাকে পৃথিবী জোড়া সবাই 'লুসি' নামে চেনেন। মানুষের এত আগের পূর্বপুরুষের, এত সম্পুর্ণ ফসিল এর আগে কখনও পাওয়া যায়নি, তাই বিজ্ঞানীমহলে রীতিমত হইচই পড়ে যায় 'লুসি'কে নিয়ে। এদের হাটুর জয়েন্টের বিশেষ গঠন থেকে বিজ্ঞানীরা দেখান যে, লুসি আসলে দ্বিপদী ছিল। অর্থাৎ, *Australopethicus* এর বিভিন্ন প্রজাতিগুলোই হয়তো পৃথিবীর বুকে

প্রথম প্রজাতি যারা দুই পায়ের উপর ভর করে হাটতে শিখেছিল। এর আগে আর কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীই দুই পায়ের উপর দাঁড়াতে শেখেনি। প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাসে এটাই বোধ হয় আমাদের প্রথম দ্বিপদী যাত্রা। এই অঞ্চলেই আরও ১৩ টি *A. afarensis* এর 'গণ কবর' পাওয়া গেছে, অনেকেই মনে করেন যে এরা হয়তো কোন আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে একসাথে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এই ফসিলগুলোর বেশীর ভাগই ২৮-৩৩ লক্ষ বছরের পুরনো, তবে কয়েকটি ফসিলের বয়স ৪০ লক্ষ বছরের কাছাকাছিও রয়েছে[৮]।।

তাঞ্জেনিয়ার একটি অঞ্চলে আরও অনেকগুলো *A. afarensis* প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে যাদের বয়স ৩৫-৪০ লক্ষ বছরের মধ্যে। আরও একটি অদ্ভুত জিনিষ পাওয়া গেছে এ অঞ্চলে - এই প্রজাতির দু'টি প্রাণীর পাশাপাশি হেটে এগিয়ে যাওয়ার সময় তাদের পায়ের ছাপগুলো ফসিলে পরিনত হয়ে গিয়েছিল - হ্যা, আক্ষরিক অর্থেই এই ফসিলগুলো আমাদের পূর্বপুরুষের পদচিহ্নই বটে। এই পায়ের ছাপগুলো যে ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে তা দেখে বোঝা যায় যে, ধারে কাছে কোন আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাতের সময় লুসির মত দু'জন হেটে গিয়েছিল এই পথ ধরে। আর তাদেরই পদচিহ্ন আঁকা হয়ে গিয়েছে মাটির বুকে। এ অগ্নুৎপাতের সময় চারদিকে আগ্নেয় ভস্ম উড়তে থাকে, ঠিক সে সময়েই যদি বৃষ্টি পড়তে শুরু করে তবে এই লবণ সমৃদ্ধ ভস্মগুলো খুব তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে জমে যায়। এ রকমই কোন এক মুহূর্তেই আমাদের আদি পূর্বপুরুষের দু'জনের এবং আরও অন্যান্য কিছু প্রাণীর পায়ের ছাপ সংরক্ষিত হয়ে

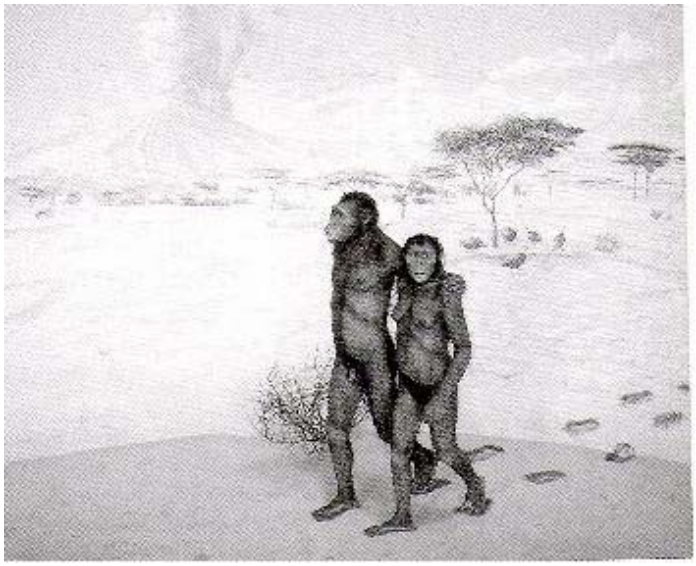

চিত্র ৯.১০: লুসির প্রজাতির দু'জনের হেটে যাওয়ার কল্পিত ছবি

গিয়েছিল সেখানে। আর এই পদচিহ্নগুলোই আজকে বহন করে চলেছে আমাদের আদি পূর্বপুরুষের দু'পায়ে হাটতে পারার ক্ষমতার নমুনা। তবে আসলেই *A. afarensis* সম্পূর্ণভাবে দ্বিপদী ছিল কিনা তা নিয়ে বহু দিন ধরেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণার অন্ত ছিল না। কিছুদিন আগে, কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে এক মজার পরীক্ষা করেছেন, তারা কম্পিউটার রোবোটিক্স-টেকনলজি ব্যবহার করে লুসির প্রজাতির পায়ের হাড়ের গঠন এবং পদচিহ্নগুলো থেকে মডেল তৈরি করে দেখিয়েছেন যে, তারা আসলেই দ্বিপদী ছিল [১৭]। ২০০৫ সালে রয়েল সোসাইটি ইন্টারফেস জারনালে তাদের এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়।

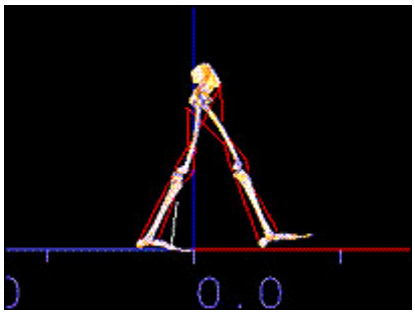

চিত্র ৯.১১: রোবোটিক্স-টেকনলজি ব্যবহার করে তৈরি *A. afarensis* প্রজাতির মডেল থেকে দেখানো হয় যে লুসিরা আসলে দ্বিপদী প্রাণী ছিল

A. afarensis এর বহু ফসিল পাওয়া গেছে দক্ষিণ, পূর্ব এবং মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে। এ থেকে দেখা যায় যে, মোটামুটিভাবে প্রায় ২০ লক্ষ বছর ধরে আফ্রিকা জুড়ে এরা বেশ ভালোভাবেই রাজত্ব করেছিল। পরবর্তী কয়েক লক্ষ বছরে আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েক ধরণের আদি মানুষের বা মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী প্রজাতির বিকাশ ঘটেছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, *A. afaricanus, A. aethiopicus, A. garhi* ইত্যাদি [৫]। এদের ফসিলগুলো ৩০ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ বছরের পুরনো। এর আগে পর্যন্ত আমরা যাদের কথা শুনেছিলাম তাদের সবার গড়নই ছিল বেশ হালকা পাতলা ধরণের কিন্তু এই *A. aethiopicus* এর গড়ণ অন্যান্যদের তুলনায় বেশ ভারী ধরণের। আফ্রিকায় ২০ থেকে ১৩ লক্ষ বছরের পুরনো আরও দু'টি এধরণের ভারী গড়নের প্রজাতির ফসিল পাওয়া গেছে, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে *Paranthropus robustus* এবং *P. boisei*। এরা কিন্তু আধুনিক মানুষের আরও সাম্প্রতিক পূর্বপুরুষ *Homo habilis* বা *H. erectus* (নীচে যাদের নিয়ে আলোচনা করা হবে) এর সাথে একই সময়ে পাশাপাশি টিকে ছিল [৮]। *Paranthropus* এর প্রজাতিগুলোর বিশাল চোয়াল, শক্ত পেশী এবং চিবানোর দাঁত দেখে বোঝা যায় যে, তারা খুব শক্ত ধরণের উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত ছিল, এরা বহু লক্ষ বছর ধরে বেশ সার্থকভাবে টিকে থেকেও শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের বইয়ের পাদটিকায় পরিণত হয়ে গেল। অনেকেই মনে করেন যে, সে সময়ে জলবায়ু এবং পরিবেশের যে তীব্র ওঠানামা ঘটছিল তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরেই শেষ পর্যন্ত এরা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

চিত্র ৯.১২: *Paranthropus boisei* প্রজাতি

অনিচ্ছা স্বত্তেও উপরে বিভিন্ন প্রজাতির অনেক কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক সব নামগুলো উল্লেখ করতে হল, এরচেয়ে সহজভাবে কি করে এটা লেখা যেত তা বের করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এভাবেই লিখতে বাধ্য হলাম। আর কিছু না হোক, আশা করি পাঠকের কাছে অন্তত এতটুকু পরিষ্কার হয়েছে যে, এই পুরো সময়টা ধরে একটি নয়, দু'টি নয় বরং বহু দ্বিপদী প্রজাতির পদচারণায় মুখরিত ছিল আমাদের এই পৃথিবী। অর্থাৎ, অন্যান্য সব প্রাণীর মতই আমাদেরও পূর্বপুরুষদের মধ্যে বহু রকমের প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, প্রাকৃতিক নিয়মেই একদিকে যেমন বিভিন্ন ধরণের প্রজাতির বিকাশ ঘটছে, অন্যদিকে কালের পরিক্রমায় তাদের অনেকেই বিলুপ্তও হয়ে গেছে। আগেও যেমনটা দেখেছি - বিবর্তনের পথটা একটা মইয়ের মত সোজা উপরে উঠে যায় না, বরং আঁকাবাঁকা পথে বহু শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট্য ঝোপঝাড় তৈরি করতে করতে এগোয়। ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয় যে, সবসময়ই এক প্রজাতি থেকে পরবর্তী আরও

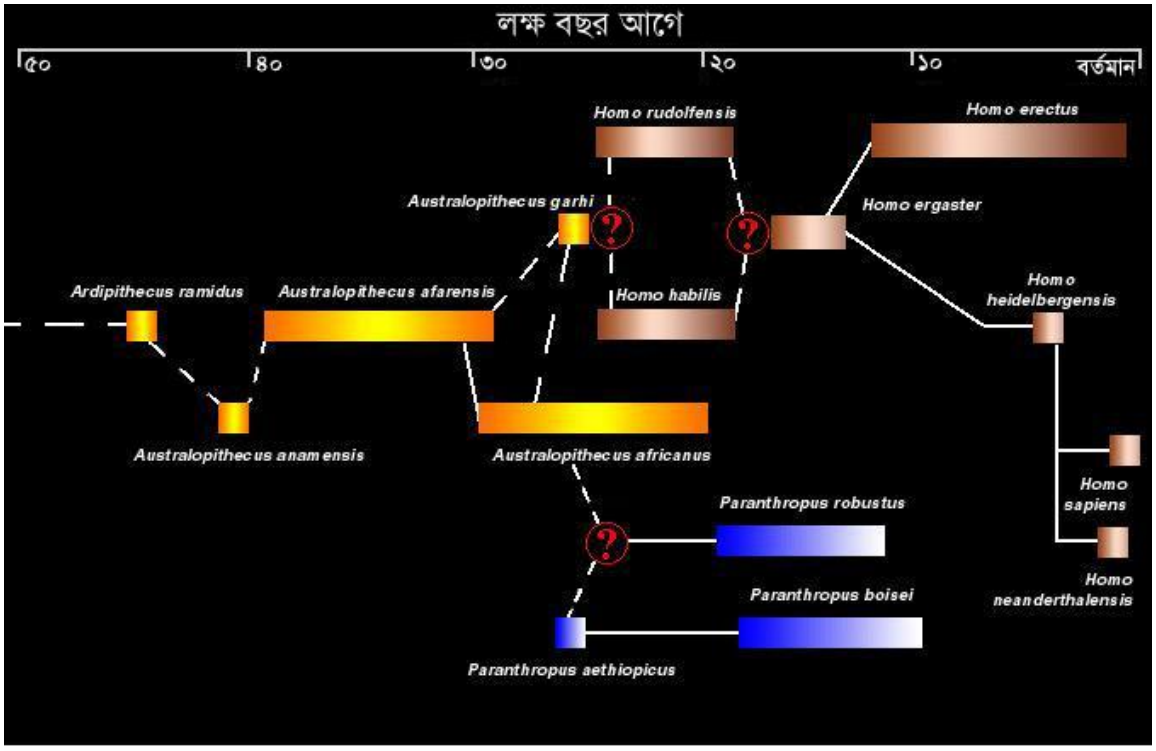

চিত্র ৯.১৩: গত ৫০ লক্ষ বছরে মানুষ এবং এপের মধ্যবর্তী প্রজাতি এবং মানুষের আদি প্রজাতি এবং আধুনিক মানুষের বিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের বিকাশের ধারাবাহিক চিত্র [১৮]ঃ

অগ্রসর প্রজাতিটির উদ্ভব ঘটে, তারপর তার থেকেও অগ্রসরটির...এভাবে। বিবর্তন তো পূর্বনির্ধারিত কোন সরলরৈখিক পথ নয়, বরং তার উলটোটাই ঘটতে দেখা যায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই। জীবের মধ্যে ক্রমাগতভাবে বিবর্তন ঘটতে থাকে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের, এক প্রজাতি থেকে উদ্ভুত হয় বহু প্রজাতি, এমনকি সেখান থেকে ছোট ছোট বহু উপপ্রজাতিও তৈরি হতে পারে। আবার কোন প্রজাতি প্রায় একই অবস্থায়ও থেকে যেতে পারে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। একদিকে যেমন বহু ধরণের প্রজাতি, উপপ্রজাতি বিকশিত হয়, তেমনিভাবে আবার তাদের মধ্যে কেউ দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকে, কেউ বা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালের মানুষের প্রজাতিগুলোর বিবর্তনের ইতিহাসেও আমরা এই একইরকমের আঁকাবাকা, বন্ধুর এক পথের চিত্র দেখতে পাবো । উপরে দেখা প্রজাতিগুলো আমাদের আধুনিক মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষ নাকি আমাদের এই পূর্বপুরুষদের কোন নিকট আত্মীয় তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে তারা যে বিবর্তনের ইতিহাসে প্রথমবারের মত দু'পায়ের উপর ভর করে দাড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করেছিল তা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। তারা যদি আমাদের সরাসরি পূর্বপুরুষ নাও হয়ে থাকে, তাদেরই আশেপাশের কোন প্রজাতি বা উপপ্রজাতি থেকেই যে আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে তা নিয়ে কিন্তু সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

বিজ্ঞানীরা এই প্রজাতিগুলোকে মানুষ ও অন্যান্য বনমানুষের মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করেন। অনেকে এও বলেন যে, লুসি গলা

এবং ঘাড়ের নীচের অংশে মানুষ কিন্তু উপরের অংশে বনমানুষ বৈ আর কিছুই নয়। লুসির প্রজাতির প্রাণীদের কোমরের হাড় মানুষের মত বেশ চওড়া হয়ে গেছে এবং হাটুর জয়েন্টের গঠনও মানুষের কাছাকাছি। এছাড়া বাকী বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার করলে কিন্তু তাদেরকে বনমানুষের দলেই ফেলতে হয়।

মস্তিষ্কের আকার শরীরের চেয়ে অনেক ছোট, মাত্র ৪০০ মিলি লিটার (robust প্রজাতিদের মস্তিষ্কের আকার ছিল একটু বড়, ৫০০ মিলি লিটারের মত), চোয়ালের আকার বনমানুষের মতই, হাতগুলো শিম্পাঞ্জি এবং গরিলার মত বেশ লম্বা, ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে আকারে পার্থক্যটাও বেশ চোখে পড়ার মত। তাদের আঙ্গুলগুলোও বেশ বড় এবং বাঁকানো যা থেকে

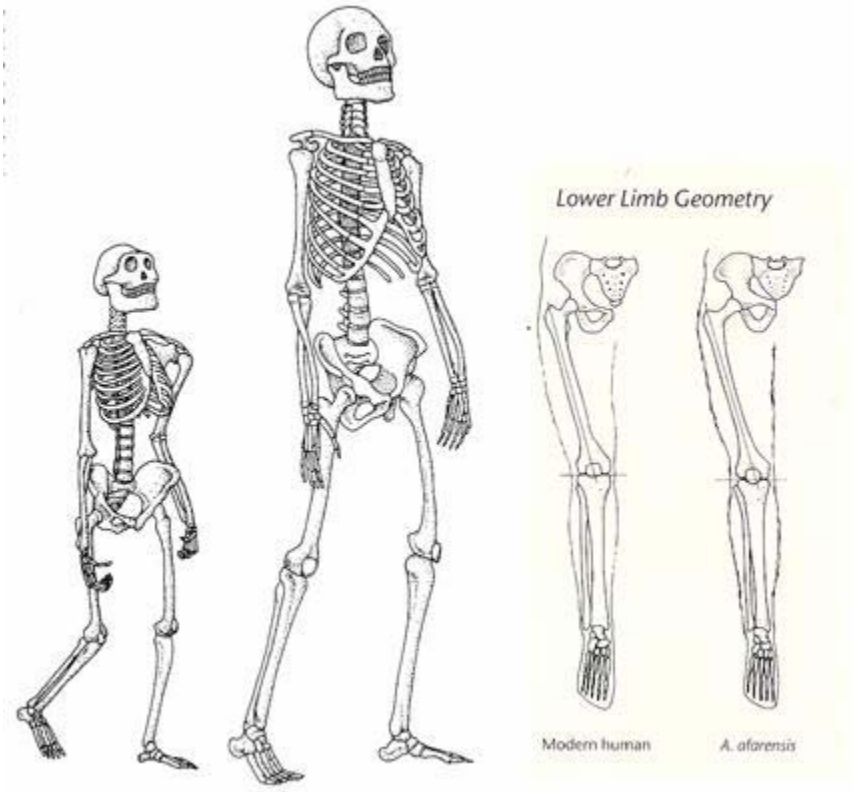

চিত্র ৯.১৪: লুসি বা *A. afarensis* এর সাথে মানুষের কঙ্কালের তুলনাঃ মানুষের তুলনায় লুসি অনেক ছোট, পুরোপুরি দ্বিপদী হলেও পেলভিসের গড়ন এবং পায়ের দৈর্ঘ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়।

বোঝা যায় যে, তারা তখনও গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে রাখতে বেশ পটু ছিল। তবে ২০ লক্ষ বছরের দিকে আমরা এদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের যে প্রজাতিগুলো দেখতে পাই তাদের অনেকের মধ্যেই আধুনিক মানুষের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে শুরু করেছিল। পরবর্তিকালের এই আধুনিক মানুষের কাছাকাছি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রজাতিদের *Homo* দলের (গণ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়, আর আমরা নিজেরা এই দলেরই একজন বলে আমাদেরকে নাম দেওয়া হয়েছে *Homo sapiens*। চলুন এবার তাহলে আরও সাম্প্রতিক কালের পূর্বপুরুষদের বিবর্তনের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখা যাক।

আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষঃ *Homo* দের বিবর্তনের গল্প;

'মানুষ' বলতে আমরা তাহলে কাদেরকে বোঝাবো? বিবর্তনের ইতিহাসে কোন প্রজাতিগুলোকে মধ্যবর্তী ফসিল বলবো আর কাদেরকে আমাদের সরাসরি পূর্বপুরুষ বলবো? পৃথিবীর এই অফুরন্ত প্রাণের মেলায় আমরাই তো একমাত্র প্রাণী যারা নিজেদের ভূতভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামাতে পারি, উৎপত্তি বা বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে পারি, বই লিখতে পারি, বক্তৃতা দিতে পারি! তাই ইতিহাসের চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে বিবর্তনের ভাষায় 'মানুষ' বলতে কি বোঝায় তা বের করার দায়িত্বটাও আমাদের কাঁধেই এসে বর্তায়। আমাদেরকেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে - ঠিক কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবর্তনের কারণে আমরা আজকের আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছি? কোন সময় থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিলো? কাদেরকে আমরা বলবো আমাদের সরাসরি পূর্বপুরুষ আর কাদেরকেই বা আখ্যায়িত করবো মধ্যবর্তী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মিসিং লিঙ্ক বলে?

দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে পারাটা অবশ্যই মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের একটা বড় মাইলফলক। তবে আগে অনেকেই মনে করতেন যে, দ্বিপদী হয়ে ওঠাটাই মানুষের পূর্বপুরুষের মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধির পেছনের সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে। খাড়া হয়ে দাঁড়াতে শেখার ফলে তাদের দুই হাত মুক্ত হয়ে গিয়েছিল, তারা শ্রম করতে পেরেছে, হাত দিয়ে হাতিয়ার বানাতে শিখেছে এবং তার ফলেই ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারণাটা আসলে বিভিন্ন কারণেই ভুল - আমরা আগেই দেখেছি যে কোন প্রয়োজন থেকে জীবের বিবর্তন ঘটে না, বিবর্তন কারও ইচ্ছা নির্ভর নয়, এভাবে চিন্তা করাটা সেই ভুল ল্যামার্কীয় দৃষ্টিভঙ্গীরই (তৃতীয় অধ্যায়ে ল্যামার্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল) প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে তো শ্রম করার 'জন্য' মস্তিষ্কের বিবর্তন ঘটতে পারেনা, শারিরীকভাবে জীবের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটির উদ্ভব না ঘটলে কোন 'উদ্দেশ্যকে' সামনে রেখে তার উদ্ভব ঘটা সম্ভব নয়। ওদিকে আবার প্রায় ২০ লক্ষ বছর ধরে আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় দ্বিপদী 'লুসি'দের যে ফসিল রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তাতে কিন্তু মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধির কোন নমুনা পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের মস্তিষ্ক কিন্তু শিম্পাঞ্জিদের মস্তিষ্কের সমানই রয়ে গেছে। আসলেই যদি দুই হাত মুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে বা শ্রম করার ফলেই তাদের মধ্যে মস্তিষ্কের বিবর্তন ঘটতে শুরু করতো তাহলে তো এই দীর্ঘ ২০ লক্ষ বছরে তার চিহ্ন দেখা যেত [১৯]! আসলে দ্বিপদী হওয়া ছাড়া এই লম্বা সময়ের মধ্যে তাদের মধ্যে আর তেমন কোন পরিবর্তনই দেখা যায় না, হাটতে শিখলেও তারা তখনও বোধ হয় বেশ বড় একটা সময় গাছেই কাটাতো, আধুনিক মানুষের সাথে নয় বরং শিম্পাঞ্জির সাথে তাদের মিলটাই যেন একটু বেশী ছিল। তাই বিজ্ঞানীরা এখন আর দ্বিপদী হওয়ার বৈশিষ্ট্যটিকে আধুনিক মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন না। দুই পায়ের উপর দাঁড়াতে শেখাটাই প্রথম বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তনের পর্বের সুচনা করেছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশই নেই; তবে তারও বেশ খানিকটা সময় পরে যখন মানব প্রজাতিগুলোর মধ্যে আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে শুরু করেছিল সেই সময়টাকেই মানুষের বিবর্তনের সন্ধিক্ষণ বলে ধরা হয়।

একসময় বিজ্ঞানীরা হাতিয়ারের ব্যবহারের শুরুকেও মানুষের বিবর্তনের এক গুরুত্বপুর্ণ পর্যায় বলে মনে করতেন। মানুষকে 'Man the Toolmaker' হিসেবে ভাবার পিছনে আসলে অনেকগুলো কারণও ছিল - ভাবা হত যে, এর জন্য যে বুদ্ধি এবং হাতের কলাকৌশলের প্রয়োজন তা একমাত্র যেন *Homo* প্রজাতিগুলোরই আছে। কিন্তু পরে বোঝা গেল যে ব্যাপারটা বোধ হয় ঠিক সেরকম নাও হতে পারে। যে সময়ে এই হাতিয়ারগুলো পাওয়া গেছে সে সময়ে তো *Homo* সহ *Australopethicus* দেরও বেশ কয়েক প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল, তারাও তো এই হাতিয়ারগুলো বানিয়ে থাকতে পারে! আসলেই কারা এই

হাতিয়ারগুলো বানিয়েছিল তা এক্কেবারে দিব্যি দিয়ে কিন্তু বলা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে দেখেছেন যে, শিম্পাঞ্জীদের বিভিন্ন দলের মধ্যেও ছোট খাটো ধরণের সরল হাতিয়ারের ব্যবহার দেখা যায়, এই হাতিয়ারগুলো বানাতে এবং ব্যবহার করতে তো তাহলে বড় মস্তিষ্কের প্রয়োজন নেই! তাই অনেকেই আর হাতিয়ার তৈরির শুরুকে মানব বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলে মনে করেন না [৮] ।

তাহলে কোন বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে আমরা আধুনিক মানুষের সরাসরি পূর্বপুরুষদের আলাদা করবো? বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের আকার এবং ভাষার উৎপত্তিকে আমাদের বিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায় বলে মনে করেন, এর সাথে সাথে পরিবেশের পরিবর্তন এবং সেই পরিবেশে টিকে থাকার জন্য হাতিয়ারের ব্যবহার ও খাদ্যাভাসের পরিবর্তনও হয়তো বেশ জোড়ালো ভুমিকা রেখেছিল [১০]। এছাড়াও অনেকে মুখ বা নাকের বিশেষ গড়ন, মানব শিশুর অত্যন্ত অপরিণত অবস্থায় জন্ম লাভ করার মত বৈশিষ্ট্যেগুলোকেও

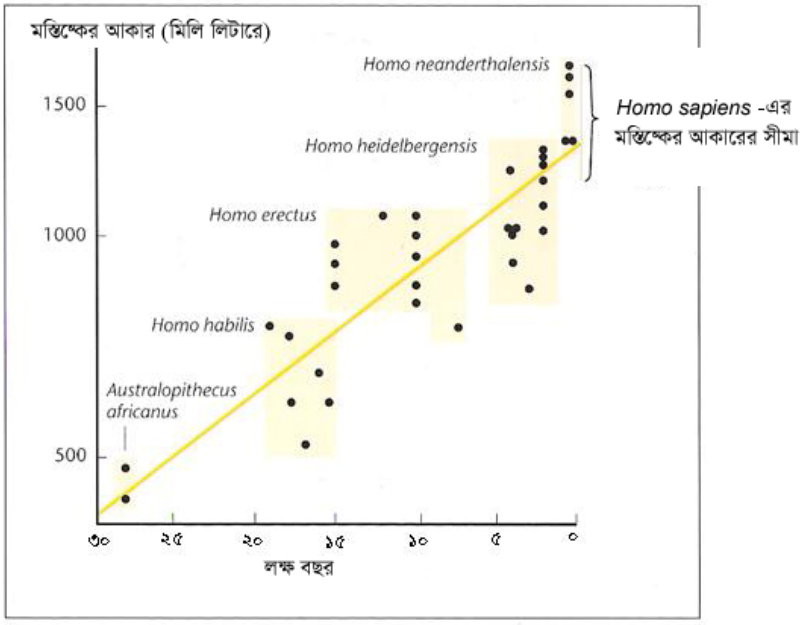

চিত্র ৯.১৫ঃ মানুষের পুর্বপুরুষদের মধ্যে ক্রমশঃ মস্তিষ্কের আকার বড় হওয়ার রেখচিত্র

গুরুত্ব দেন। আমরা যখন মস্তিষ্কের আকারের কথা বলি তখন কিন্তু সরাসরি মস্তিষ্কের আকারটা কত বড় তা কিন্তু বোঝাইনা বরং শরীরের সাথে মস্তিষ্কের আনুপাতিক হারকেই বোঝাই। অনেক বড় কোন প্রাণীর মস্তিষ্ক আরও বড় হতে পারে, সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়, বরং একটা প্রাণীর শরীরের তুলনায় তার মস্তিষ্ক কত বড় তা দিয়েই তার বুদ্ধিমত্তা বিচার করা হয়। উপরে সময়ের সাথে সাথে মানুষের পুর্বপুরুষের মধ্যে ক্রমশঃ মস্তিষ্কের আকার বড় হওয়ার একটা সারণী দেখানো হয়েছে।

এখানে আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই খুবই 'মানবসুলভ' বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু একদিনে উদ্ভুত হয়নি, এরা কোন মোড়কের ভিতরে একসাথে বিবর্তিত হয়ে হঠাৎ করে দেখা দেয়নি, বরং সময়ের সাথে সাথে অত্যন্ত ধীর গতিতে একেক সময়ে হয়তো একেক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটেছে। তাই ঠিক কোন সময়টাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা দিতে শুরু করেছিল তা বলা একটু মুশকিলই বলতে হবে। প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর আগে প্রজাতিগুলোতে একদিকে যেমন প্রথমবারের মত মস্তিষ্কের আকারে বেশ বড়সড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তেমনি আবার তাদের

মধ্যে ধীরে ধীরে আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলোও দেখা দিতে শুরু করে।

আগেই দেখেছিলাম যে, এ সময়টাতে মানুষের পূর্বপুরুষের বেশ কয়েকটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়। আগেই দেখেছিলাম যে *Paranthropus* এবং *Australopethicus* এর বেশ কয়েকটি প্রজাতি এসময়ে টিকে ছিল, আর সেই সাথে প্রথম *Homo H. habilis, H. rudolfensis* দলের অন্তর্ভুক্ত দেরও অস্তিত্ব দেখা যায়। পঁচিশ লক্ষ বছর আগে থেকে শুরু করে তার পরবর্তী প্রায় ১০ লক্ষ বছর ধরে এত রকমের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রজাতি দেখা যায় যে এদের শ্রেনীবিন্যাস নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। এ সময়টাতে এত প্রজাতির বিকাশ এবং বিলুপ্তির পিছনে জলবায়ু এবং পরিবেশের দ্রুত ওঠানামা হয়তো বিশেষ এক ভুমিকা রেখেছিল। এ প্রসঙ্গে আরেকটি সাধারণ ভুল ধারণা সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে নিলে বোধ হয় খারাপ হয় না। অনেকেই হুট করে বলে বসেন যে, পরিবেশের এই পরিবর্তনের জন্যই আ কারণেই মানুষের বিবর্তন ঘটেছিল। আবারও একই কথা বলতে হয়, কোন 'কারণের জন্য' কিন্তু বিবর্তন ঘটেনা। ব্যাপারটা এমন নয় যে, পরিবেশ বদলানোর সাথে সাথে নতুন নতুন প্রাজতি জন্ম লাভ করতে থাকলো; মিউটেশন, জেনেটিক রিকম্বিনেশন ইত্যাদির ফলে যদি কোন প্রজাতির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো ইতোমধ্যেই বিরাজ না করে তাহলে নতুন করে তা গজিয়ে উঠতে পারে না। পরিবেশ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঘটে একইভাবে - এই পরিবেশের পরিবর্তনগুলো ঘটার সময়ে যে প্রজাতিগুলো ছিল তাদের মধ্যে যারা বৈশিষ্ট্যগত কারণে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল তারাই শুধু টিকে গিয়েছিল, আরা যারা পারেনি তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে আফ্রিকার ঘন অরণ্যগুলো কমে আসতে শুরু করে, বিভিন্ন জায়গায় গাছবিহীন শুকনো অঞ্চল এবং তৃনভুমি জন্ম নেয়। এমনটা তো হতেই পারে যে, এদের মধ্যে যারা শুধু গাছের ডালে ডালে থাকার চেয়ে বেশ কিছুটা সময় মাটিতে চলাচল করতে শুরু করেছিল এবং দূর দূরান্ত থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বয়ে নিয়ে আসার উপায় রপ্ত করতে পেরেছিলো তারাই টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। এ কারণেই হয়তো এ সময়ে দ্বিপদী নয় এমন বেশীরভাগ বনমানুষ প্রজাতির দ্রুত বিলুপ্তি ঘটে যেতে দেখা যায়, আর অন্যদিকে দ্বিপদী বনমানুষদের অর্থাৎ আমাদের পুর্বপুরুষদের দ্রুত বিকাশ ঘটতে শুরু করে। অনেক বিজ্ঞানীই এখন মনে করেন যে, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়েই বড় মস্তিষ্কের অধিকারী বুদ্ধিমান মানুষের হাতিয়ারের ব্যবহার শুরু করেছিল এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিকভাবে জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল, আর সেখান থেকেই ধীরে ধীরে আমরা এত উন্নত এবং জটিল সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি।

সে যাই হোক, আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের কাহিনী শোনা যাক এবার। ২০ লক্ষ বছর আগের তানজানিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে *H. habilis* দের যে ফসিলগুলো পাওয়া গেছে তাদের সাথে বিভিন্ন ধরণের পাথুড়ে হাতিয়ারও পাওয়া গেছে [৮]। এগুলোই কিন্তু মানব ইতিহাসে প্রথম হাতিয়ার! তাই মনে করা হয় যে, এরাই বোধ হয় প্রথম পাথুরে যন্ত্র তৈরি করতে শিখেছিলো এবং নিজেরা শিকার না করলেও মাংস খেতে শিখেছিলো। মাংসে থাকে অনেক বেশি পুষ্টি ও ক্যালোরি আর তা সহজেই হজম হয় বলে সেখান থেকেই আপেক্ষাকৃত ছোট ক্ষুদ্রান্ত্রেরও বিবর্তন ঘটেছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন তার ফলে শরীরের যে শক্তি বেঁচে গেলো তা হয়তো ব্যবহৃত হয়েছিল বড় মস্তিষ্কের বিবর্তনে [২০]। তারা দেখতেও বেশ ছোটখাটো, দাঁতের আকারও বেশ ছোট, এদের পা দেখতে অনেকটা আধুনিক মানুষের মত হলেও হাত তখনও বনমানুষের মতই বড় রয়ে গেছে, ওদিকে আবার খুব সামান্য হলেও মস্তিষ্কের আকার কিন্তু বড় হতে শুরু করে দিয়েছে। এদের মস্তিষ্কের আকার ৫৯০ সিসি থেকে শুরু করে ৬৯০ সিসি, যা পূর্ববর্তী সব প্রজাতির চেয়ে কিছুটা হলেও বড়। তবে এতটুকু বৃদ্ধিকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং তার ভিত্তিতে এদেরকে *Homo* র দলে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কিনা তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও কিছু বিতর্ক দেখা যায়।

চিত্রঃ ৯.১৬: *H. habilis* দের দাঁতের এবং চোয়ালের গঠণ এবং আশেপাশের ফসিইলগুলো দেখে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে তারা মোটামুটিভাবে যা পেত তাই খেত, সব ধরণের খাওয়াতেই তারা অভ্যস্ত ছিল.

ওদিকে আবার একই সময়ের দিকে বেশ বড় ধরণের মানুষের এক প্রজাতিরও ফসিল পাওয়া গেছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে *H. rudolfensis*, এরা *H. habiis* দের তুলনায় বেশ বড়, এদের মস্তিষ্কের আকার ৭০০-৮০০ সিসির কাছাকাছি। হাত পায়ের অনুপাতের দিক থেকে এরা অনেকটা আধুনিক মানুষের মত হলেও, এদের বড় এবং শক্ত ধরণের চোয়াল বা দাঁতের গঠন কিন্তু ঠিক সেরকম নয়। এই সবগুলো প্রজাতিই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আধুনিক মানুষের চেয়ে বরং লুসির প্রজাতির অনেক কাছাকাছি। আসলে এর পরে বিবর্তনের পদযাত্রায় আমরা যাদের দেখা পাই, সেই *H. erectus* প্রজাতিটিকেই বরং আমাদের সবচেয়ে কাছের পূর্বপুরুষ বলে মনে হয়।

সেই উনিশ শতকে যখন এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে *H. erectus* এর ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে তখন অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে, আফ্রিকায় মানুষের উৎপত্তি নিয়ে ডারউইন যা ভেবেছিলেন তা আসলে ভুল ছিল। আফ্রিকায় নয়, বরং এশিয়ায়ই হয়তো প্রথম মানুষের পূর্বপুরুষের বিবর্তন ঘটেছিল। এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় এদের ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করে, তাদের মধ্যে পিকিং ম্যান, জাভা ম্যান বেশ বিখ্যাত। চায়নায় যে ফসিলগুলো পাওয়া যায় তাদের বয়স ১০ লক্ষ বছর থেকে শুরু করে আড়াই লক্ষ বছরের মধ্যে। এরা দেখতে অনেকটাই বোধ হয় আমাদের মত, চেহারা, কপাল এবং চোয়ালের গঠন ফ্ল্যাট হয়ে এসেছে, আগের দেখা মানব প্রজাতিদের তুলনায় মস্তিষ্কের আকারও বেশ অনেক বড়, প্রায় ১০০০ সিসির মত, পায়ের গঠনও আধুনিক মানুষের মতই লম্বা। কিন্তু তার পরপরই আফ্রিকা জুড়ে মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির ফসিল পাওয়া যেতে শুরু করলো, আর তখন দেখা গেল যে আসলে ডারউইনের ধারণাই ঠিক ছিল। এশিয়ার বিভিন্ন জায়গা জুড়ে যে প্রজাতিগুলোর ফসিল পাওয়া গিয়েছিল তাদের পূর্বপুরুষ আফ্রিকাবাসী *H. erectus* রা ছাড়া আর কেউ নয়। প্রায় বিশ লক্ষ বছর আফ্রিকায় বিকাশ লাভ করে *H. erectus* প্রজাতি আর তাদেরই একটা অংশ পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে। এদের আফ্রিকাবাসী পূর্বসুরীদের অনেকেই *H. ergaster* বলেও অভিহিত করেন। ফসিল

রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, এই প্রজাতির মানুষেরা ইতোমধ্যেই তাদের পূর্বপুরুষ প্রজাতিদের ভোতা

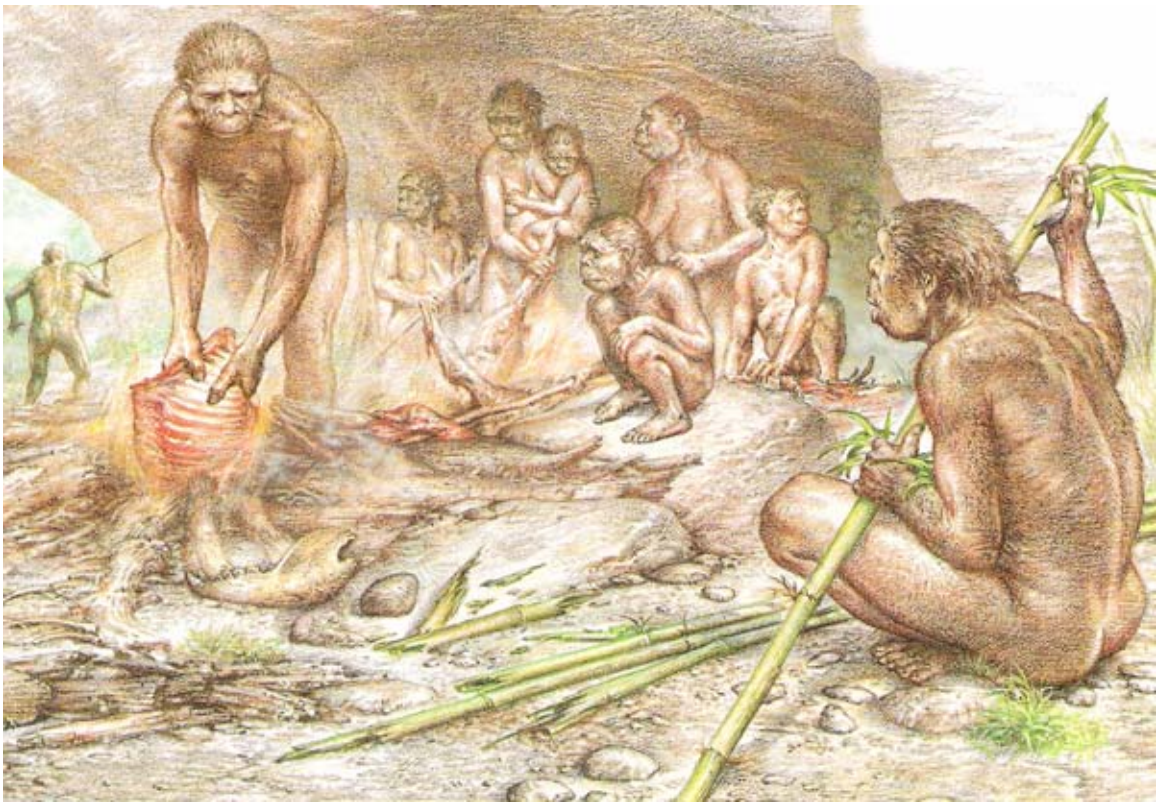

চিত্রঃ ৯.১৭: কোন এক *H. erectus* গোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের কল্পিত ছবি

অস্ত্রগুলোকে শান দিকে ধারালো করতে শিখছে, শিখে গেছে আগুনের ব্যবহার! তারাই সম্ভবত প্রথম মানব প্রজাতি যাদের একটি অংশ আফ্রিকা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে[৮]। তবে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রচ্যে পরবর্তীতে *H. heidelbergensis* নামে যে প্রজাতিটি দেখা যায় তারা সম্ভবত আফ্রিকা থেকে প্রথমবার বেড়িয়ে পড়া *H. erectus* দেরই উত্তরসুরী। তবে এরা আসলেই *H. erectus* দের থেকে বিবর্তিত হয়েছিল নাকি তারা আলাদা কোন প্রজাতি বলে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখন মতভেদ দেখা যায়। আর এদের থেকেই পরবর্তীতে নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এদের কেউই কিন্তু আমাদের অর্থাৎ *H. sapiens* দের সরাসরি পূর্বপুরুষ নয়।

> আমাদের উৎপত্তি ঘটেছে আফ্রিকাবাসী সেই আদি *H. erectus* দের অংশ থেকেই প্রায় দুই লক্ষ বছর আগে, যারা কখনই আফ্রিকা ত্যাগ করেনি। আর প্রায় বিশ লক্ষ বছর আফ্রিকা থেকে বের হয়ে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রজাতিগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল তারা কোন বংশধর না রেখেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে।

আমাদের নিজেদের প্রজাতি *H. sapiens* দের গল্প বলার সময় হয়ে এলো বলে। কিন্তু তার আগে নিয়ান্ডারথাল মানুষের কাহিনীটাকে আলাদা করে না বলে না নিলে বোধ হয় তাদের প্রতি অবিচারই করা

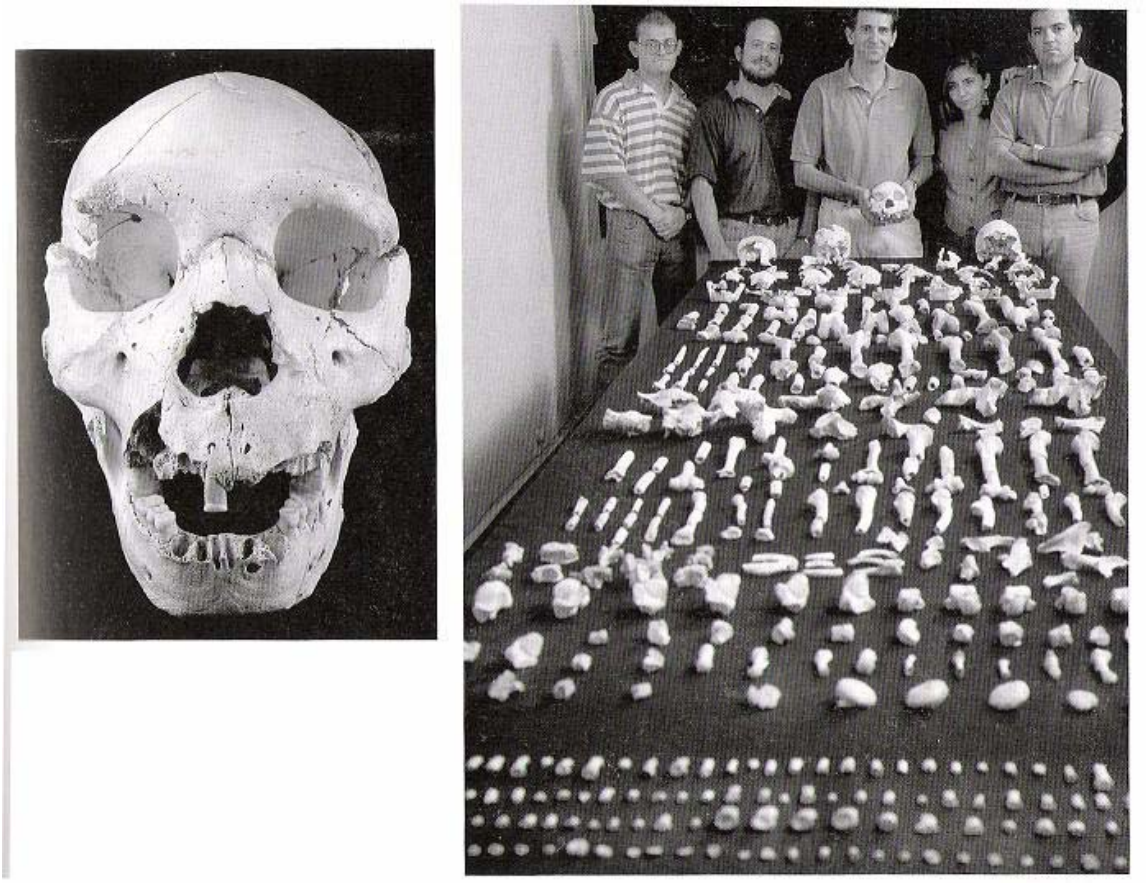

চিত্রঃ ৯.১৮: স্পেনে সিমা নামের একটি গুহার ভিতরই পাওয়া গেছে ৩ লাখ বছরেরও আগের ২,৫০০ ফসিল [৮]।

হবে। গত দেড়শ বছরে মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, ইরাক, ইসরাইল থেকে শুরু করে উত্তরে রাশিয়া, জার্মানি, পশ্চিমে স্পেন, ফ্রান্সসহ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ান্ডারথালদের ফসিল পাওয়া গেছে (তবে পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় এদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি)। ইরাকের শানিডার নামের এক জায়গায়, বিভিন্ন ধরনের ফুলের কারুকার্য করা, প্রায় ৬০ হাজার বছরের পুরনো নিয়ান্ডারথালদের কবর পাওয়া গেছে [৭]। ফসিল রেকর্ড থেকে ৪-৫ লাখ বছর আগে *H. heidelbergensis* প্রজাতি থেকে *H. neanderthalensis* প্রজাতির বিবর্তনের ইতিহাস কিন্তু খুবই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে [৮]। তারপর

চিত্রঃ ৯.১৯: *H. heidelbergensis* প্রজাতি

বহুদিন ধরেই রাজত্ব করেছিল তারা। ৫০-৭০ হাজার বছর আগে, আধুনিক মানুষের যে প্রজাতিটি আফ্রিকা থেকে বের হয়ে এসে পরবর্তীতে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে পৌঁছেছিল তাদের সাথে পাশাপাশি কিছু সময় ধরে নিয়ান্ডারথাল প্রজাতিটাও টিকে ছিলো। ৩৫ হাজার বছর আগেও তাদের অস্তিত্ব দেখা যায় বিভিন্ন আঞ্চলে। আধুনিক মানুষের প্রজাতির সাথে এদের অনেক মিল থাকলেও অমিলও ছিলো প্রচুর। আমাদের মতই বড় মস্তিষ্ক থাকলেও তাদের করোটির আকৃতি ছিলো বেশ অন্যরকম, মুখের এবং সামনের দাঁতের গঠনেও ছিল বেশ পার্থক্য। তারা আসলে আমাদের আধুনিক মানুষের প্রজাতিরই আংশ ছিল কিনা এ নিয়ে বহু বছর ধরেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের কোন অন্ত ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির ফসিল থেকে নেওয়া ডিএনএ র বিশ্লেষন থেকে দেখা গেছে যে তাদের সাথে *H. sapiens* দের কখনও প্রজনন ঘটেনি, তারা আসলে সম্পুর্নভাবে ভিন্ন একটি প্রজাতি। তাদের সাথে কি আমাদের আধুনিক মানুষ প্রজাতির দেখা হয়েছিলো, কোন রকম আদান প্রদান কি ঘটেছিলো কিংবা তাদের বিলুপ্তির পিছনে আমাদের কি কোন অবদান ছিলো - এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনও ঠিকমত জানা যায়নি।

প্রায় ৩৫-৪০ হাজার বছর আগে ইউরোপে আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষদের দেখা যেতে শুরু করে, এরা ক্রো-ম্যগনন জাতি নামে পরিচিত। বিভিন্ন ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে, এদের শিকার পদ্ধতি, হাতিয়ারের মান নিয়ান্ডারথালদের চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের ছিল, অনেকে মনে করেন যে, এদের সাথে

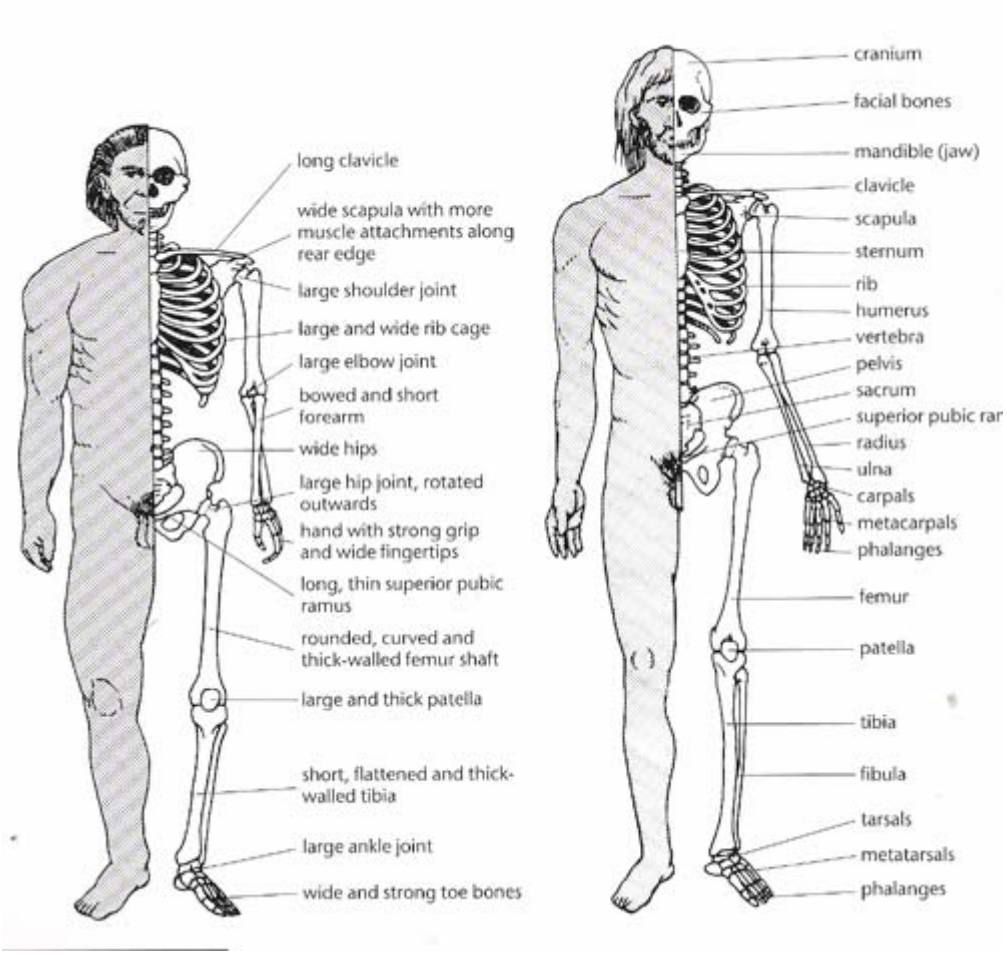

চিত্রঃ ৯.২০: ক্রো-ম্যাগননদের সাথে নিয়ান্ডারথালদের গঠনগত পার্থক্য

টিকে থাকার প্রতিযোগীতায় হেরে গিয়েই নিয়ান্ডারথালরা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ক্রো-ম্যাগনদের সাথে আধুনিক মানুষের বংশগতীয় মিল পাওয়া গেলেও নিয়ান্ডারথালদের সাথে কিন্তু তাদের কোন বংশগতীয় মিল পাওয়া যায় না। এই ক্রো ম্যাগননরাও পরবর্তীতে ইউরোপ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এছাড়াও, আমরা আগে সেই প্রথম অধ্যায়েই দেখেছিলাম যে, ইন্দোনেশিয়ায় *Homo floresiensis* প্রজাতির যে, ক্ষুদে মানুষগুলোর ফসিল পাওয়া গেছে তারা মাত্র ১২ হাজার বছর আগেও সেখানে দিব্যি টিকে ছিল। তারা খুব সম্ভবত এশিয়ায় বিস্তার করা সেই আগের দেখা *Homo erectus* প্রজাতি থেকে বিবর্তিত হয়েছিল। তাদের সাথেও আমাদের প্রজাতির কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই বলেই মনে হয়।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমাদের সামনে এটুকু স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা যতই নিজেদেরকে ‘বিশেষ সৃষ্টি’ বলে ভাবতে পছন্দ করি না কেন আসলে আমাদের বিবর্তনও ঘটেছে বিবর্তনের সেই একই অন্ধ ‘প্রাকৃতিক নিয়ম’ মেনেই। এই বিবর্তনের গতি বা হার কখনই সমান ছিলো না, এবড়ো থেবড়ো পথ পেরিয়ে, কখন দ্রুত, কখনও বা খুব ধীর গতির পরিবর্তনের মাধ্যমে, বহু প্রজাতির উদ্ভব এবং বিলুপ্তির নিষ্ঠুর পথ পেরিয়ে এগিয়ে গেছে আমাদের বিবর্তন। ডঃ রিচার্ড ডকিন্সের মতই বলতে হয় আসলেই

বিবর্তনের প্রক্রিয়াটা আচেতন এবং অন্ধ, প্রাকৃতিক নির্বাচনের কানাগলি দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মেই ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলতে থাকে এই প্রাণের বিকাশ। ভাবতেও অবাক লাগে যে এত ধরণের এতরকমের বৈশিষ্ট্যের মানুষ এবং মানুষের পূর্বপুরুষের প্রজাতিগুলো একসময় পৃথিবীর বুকে হেটে বেড়িয়েছে! এখনও অনেক কিছুই আমাদের অজানা, কিন্তু বিবর্তনের ইতিহাস জুড়ে যে বহু রকমের মানব প্রজাতির অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের প্রথম উৎপত্তি ঘটেছিল আফ্রিকায় তা নিয়ে কিন্তু আজকে সন্দেহের তেমন কোন অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন করতে হয়, তাহলে আজকের পৃথিবীতে আমারাই কেন একমাত্র মানব প্রজাতি যারা টিকে থাকতে সক্ষম হলাম? আসলে আমাদের প্রজাতির বয়স কিন্তু খুব বেশী নয়, মাত্র ২ লক্ষ বছর আগে আমাদের প্রজাতির উৎপত্তি, বলতে গেলে আমরা বিবর্তনের পাড়ার খুব নতুন বাসিন্দা। একদিকে আমাদের বিবর্তনের ইতিহাসটা যেমন অন্যান্য জীবের মতই কিন্তু এটা মেনে নিতেই হবে যে, আমাদের টিকে থাকার ইতিহাসটা বিবিধ কারণেই একটু ভিন্ন গতিতে এগিয়েছে। আর তাই এ বিষয়ে গভীরভাবে জানতে হলে বোধ হয় শুধু ফসিলের গঠন এবং সময়সীমাগুলো জানলেই হবে না, আরও কিছু বাড়তি কথাও জানতে হবে। জানতে হবে আমাদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার ইতিহাস, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তন, ভাষার উৎপত্তি কিংবা আগুনের ব্যবহারের মত ঘটনাগুলোর গুরুত্ব।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা আফ্রিকা থেকে কখন বেরিয়ে পড়েছিল? -'আফ্রিকা থেকে বহির্গমন' তত্ত্বঃ

এবারের গল্পটা আমাদের পথ চলার গল্প, আমাদের পূর্বপুরুষদের আফ্রিকার সীমানা পেরিয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার গল্প। এ যেনো অনেকটা বইয়ে পড়া গোয়েন্দা কাহিনীর মত - লক্ষ লক্ষ বছরের যাত্রাপথে কোথায় কোন স্মৃতিনিদর্শন ফেলে গেছে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন আজকের বিজ্ঞানীরা। কিন্তু সেই সুদীর্ঘ অতীতে বিভিন্ন প্রজাতির মানুষ বিভিন্ন সময়ে যে সব পথে অজানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল তাদের পদচিহ্নগুলো খুঁজে বের করা তো আর মুখের কথা নয়, তাই এ ব্যাপারে যে আমরা নানা মুনীর নানা মত শুনতে পাবো সেটাই স্বাভাবিক। এতদিন পর্যন্ত ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে পাওয়া যাওয়া ফসিল রেকর্ডগুলোই ছিল একমাত্র ভরসা। কিন্তু এখন তো আর আমাদের শুধু ফসিল রেকর্ডের মুখ চেয়ে বসে থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। অসম্ভব মনে হলেও সত্যি যে, আমাদের জিনের ভিতরই আজকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব আমাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহাসিক কাফেলার পদচিহ্ন। বিজ্ঞান আজকে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, ডিএনএ থেকেই এখন আমাদের সরাসরি পুর্বপুরুষদের ভ্রমনকাহিনী পড়ে ফেলা সম্ভব। তবে অনেক আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রজাতিগুলো সম্পর্কেও কি একইভাবে তা জানা সম্ভব? পরীক্ষা করে দেখার জন্য তাদের ডিএনএ ই বা কোথায় পাওয়া যাবে? তাই সেই আদি প্রজাতিগুলোর যাত্রাকাহিনী জানতে হলে বোধ হয় ফসিল রেকর্ডের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় খোলা নেই।

এখন পর্যন্ত পাওয়া ফসিল রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, লুসির প্রজতিরা বোধ হয় কখনই তাদের আফ্রিকার বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বাইরের পৃথিবীর মুখ দেখেনি। তার বেশ পরে, ২০ লক্ষ বছর আগে *H. erectus*-দের একটা অওংশই বোধ হয় প্রথম মানব প্রজাতি যারা আফ্রিকার মায়া ত্যাগ করে বেড়িয়ে পড়েছিল। তারা ভীষণ কোন দিগ্বিজয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়েছিল সেটা ভাবলে বোধ হয় ভুলই হবে। সম্ভবতঃ খাদ্য এবং শিকারের সন্ধানে অল্প অল্প করে নিজেদের আবাসভুমি বিস্তৃত করতে করতে এক সময় তারা নিজের অজান্তেই আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যান্য মহাদেশগুলোতে। এ সময়ের দিকেই যে আমাদের কোন এক পূর্বপুরুষ প্রজাতি আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়েছিল তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের

মধ্যে আর কোন দ্বিমত নেই। তবে এরা আসলেই *H. erectus* প্রজাতি ছিল নাকি সে সময়ে আফ্রিকায় বসবাস করা অন্য কোন *Homo* প্রজাতি ছিল তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও কিছু বিতর্ক রয়েছে। মানব প্রজাতির এই প্রথম বেড়িয়ে পড়াকে 'প্রথম আফ্রিকা থেকে বহর্গমন' বলে চিহ্নিত করা হয়। ফসিল রেকর্ড থেকে মনে হয় যে তারা প্রথম দিকে বেশ কিছু কাল আফ্রিকার আশেপাশে গরম অঞ্চলগুলোতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তারপর এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব বিস্তার করতে তাদের আরও প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর লেগে গিয়েছিল[৮]। আড়াই লাখ বছর আগে এদের উত্তরসুরীদেরই আমরা দেখতে পেয়েছি চীন, জাভাসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে, আর ওদিকে ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে মাত্র ৩৫ হাজার বছর এগেও দেখেছি নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির বিচরণ। তাপমাত্রার ওঠানামার সাথে এই মানব প্রজাতিগুলোর বিস্তৃতি ও জীবনযাপন পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। গরম যুগগুলোতে তাদের জনসংখ্যা ফুলে ফেঁপে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তো, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বরফ যুগগুলোতে আবার বহু জনগোষ্ঠী বিলুপ্তও হয়ে যেত। সাম্প্রতিককালের সর্বশেষ (২০ হাজার বছর আগে) বরফ যুগের সাথে লড়াই করতে না পেরেই বোধ হয় ইউরোপের ক্রোম্যাগনন জাতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল [৮]।

আমাদের নিজেদের প্রজাতির আধুনিক মানুষেরা অর্থাৎ *H. sapien* রা যে, আফ্রিকা থেকে উদ্ভুত হয়ে খুব সাম্প্রতিককালে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে তা নিয়েও এখন আর কোন দ্বিমত নেই। তবে তারা ঠিক কোন কোন পথে আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়েছিলো, এবং ঠিক কোন সময়টাতে এবং কতবার তা ঘটেছিল তা নিয়ে এখনও বিতর্কের অবকাশ রয়ে গেছে। আর আমাদের এই যাত্রাকেই মানব ইতিহাসে 'দ্বিতীয়বারের মত আফ্রিকা থেকে বহর্গমন' বলে অভিহিত করা হয়। প্রায় দুই লাখ বছর আগে আফ্রিকায় আমাদের এই আধুনিক মানুষের প্রজাতির উদ্ভব ঘটলেও প্রথম এক লক্ষ বছর তারা বোধ হয় আফ্রিকার সীমানা পেরিয়ে বাইরে বেরোয়নি। ইথিওপিয়া থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের এই পূর্বপুরুষদের ফসিল পাওয়া গেছে। আর আফ্রিকার বাইরে প্রথম যে ফসিল পাওয়া যায় তারা ৯০ হাজার বছরের চেয়ে বেশী পুরনো নয়। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাইলে তাদের বসতি দেখা গেলেও সেখান থেকে পরবর্তীতে তারা আর কোথাও বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল বলে মনে হয় না ২১। এর পরের কাহিনী নিয়ে ফসিলবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, কিন্ত এখন মনে হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে খুব অচিরেই খুব অচিরেই সেই বিতর্কেরও ইতি ঘটাতে পারবো। বইটি লেখার সময়ে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় এ নিয়ে একটি চমৎকার প্রতিবেদন (২০০৬) প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক জেনেটিক্সের আলোয় আমরা ইতোমধ্যেই বেশ পরিষ্কারভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই মহাযাত্রার কাহিনীটা একে ফেলতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের পূর্বপুরুষদের একটা অংশ মাত্র ৫০-৭০ হাজার বছর আগে আফ্রিকা ছেড়েছিল আর আজকে পৃথিবীব্যাপী আমি বা আপনিসহ যে ছয়শো কোটি মানুষের মুখ দেখতে পাই তারা সবাই এদের উত্তরসুরী ।

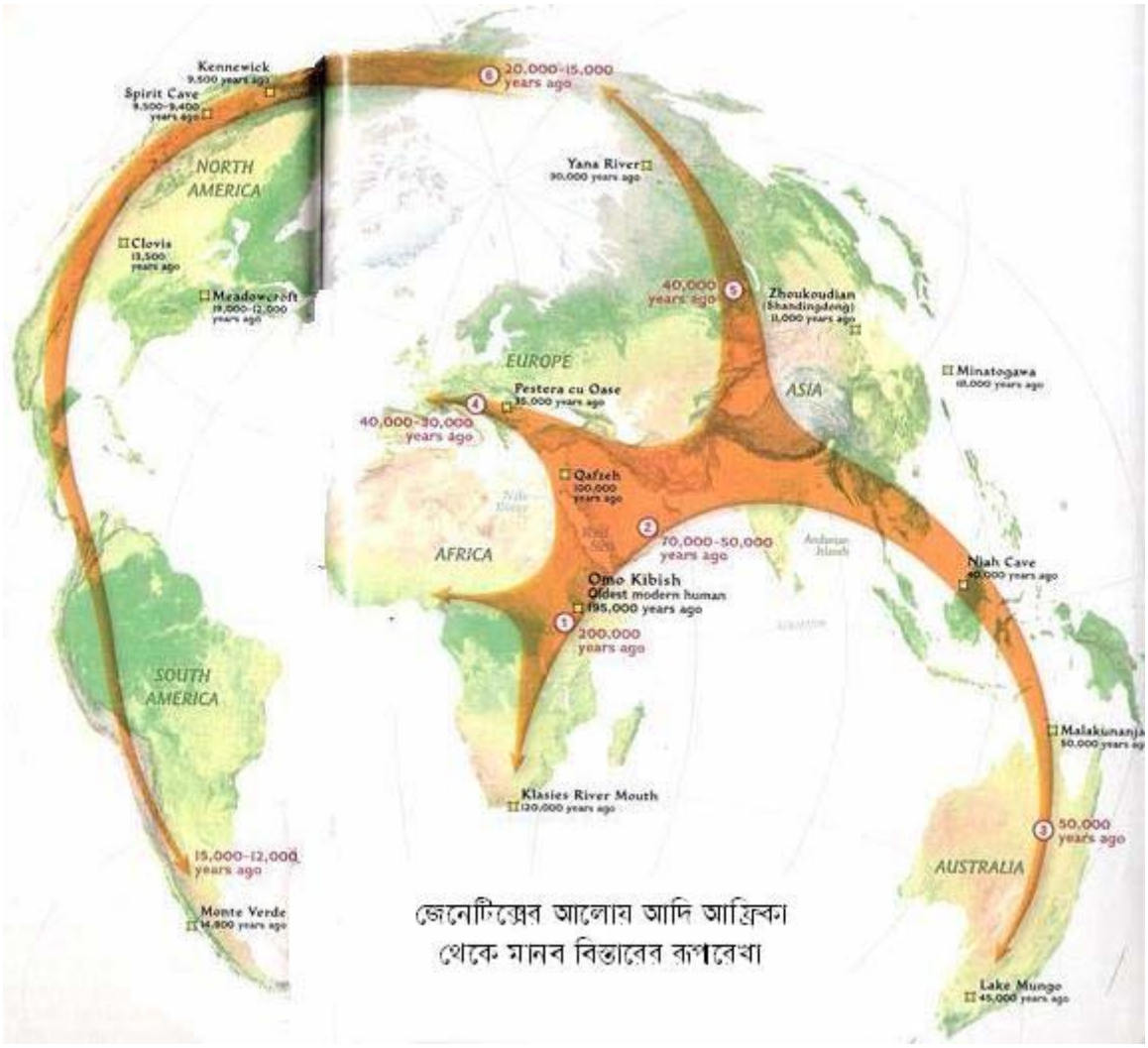

চিত্রঃ ৯.২১: জেনেটিক্সের গবেষণা থেকে *Homo sapines* দের আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়ার সময়সীমা

কিন্তু কিভাবে সম্ভব আজকে আমার বা আপানার ডিএনএ থেকে হাজার বছরের্ এই ইতিহাস খুঁজে বের করা? কি দেখেই বা বিজ্ঞানীরা এত আস্থা নিয়ে বলতে পারছেন সে কাহিনীর ইতিবৃত্ত? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা ডঃ রিচার্ড ডকিন্সের কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, বিজ্ঞানী স্পেনসার ওয়েলস এর মুখে - আমাদের প্রতিটি রক্তকণাই যেনো জিনের ভাষায় লেখা ইতিহাসের একেকটা বই ২১। সব মানুষের দেহে যে জেনেটিক কোড রয়েছে তা প্রায় ৯৯.৯% এক। গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, আফ্রিকাবাসীদের জেনেটিক কোডের মধ্যে যে পরিমাণ বৈচিত্র দেখা যায় তার তুলনায় বাকি পৃথিবীর মানুষের মধ্যে তেমন কোন বৈচিত্র নেই বললেই চলে। আফ্রিকার যে সব জেনেটিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তারই একটা সাব-সেট বা ক্ষুদ্র অংশ দেখা যায় বাকিদের মধ্যে। তার অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে? আফ্রিকাবাসীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ আফ্রিকায় উদ্ভুত হয়ে, বিকশিত হয়ে পরবর্তীতে তাদের একটা অংশ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়লেই শুধুমাত্র এটা হওয়া সম্ভব। সে না হয় গেলো এক কাহিনী, এবার চলুন চট করে একবার দেখে নেওয়া যাক বিজ্ঞানীরা কি করে আফ্রিকা থেকে বহির্গমনের ইতিহাস বের করলেন। আমরা জানি যে,আমাদের জিনে

কখনও কখনও বিক্ষিপ্তভাবে মিউটেশন ঘটে থাকে। জেনেটিক্সের নিয়ম মেনে তারপর তা পরবর্তী বংশধরদের ডিএনএ তেও দেখা যায়। এই মিউটেশনুলোকেই জেনেটিক মার্কার বা নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করেন বিজ্ঞানীরা। বহু প্রজন্ম পরে যদি আপনার এবং আমার দুজনেরই ডিএনএ তে একই মিউটেশন দেখা যায় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, কোন না কোন সময়ে আমাদের একই পূর্বপুরুষ ছিল। বিভিন্ন জনপুঞ্জের মধ্যে এই সাধারণ নির্দেশকগুলোকে খুঁজে বের করে তুলনামুলক পর্যালোচনা করতে পারলেই বোঝা যাবে তারা সবাই একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভুত হয়েছে কি হয়নি।

আর এই মিউটেশন বা নির্দেশকগুলো প্রথম কখন ঘটেছিল এবং কোন জনপুঞ্জের মধ্যে কোন সাধারণ নির্দেশকগুলোর অস্তিত্ব রয়ে গেছে তা জানতে পারলেই বোঝা যাবে কখন কোন জনপুঞ্জ কখন তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তবে এখানে আরেকটু কথা আছে, যে কোন কোষের ডিএনএ থেকে আবার এই পরীক্ষা করা যাবে না। বাবা মার জিনের জেনেটিক রিকম্বিনেশনের মাধ্যমে যেহেতু আমাদের জন্ম হয়, আমাদের বেশীরভাগ কোষেই এই মিউটেশনগুলো আর ঠিকমত নাও দেখা যেতে পারে। তাহলে কোথা থেকে আমরা এই আদি তথ্যগুলো অবিকৃত অবস্থায় পেতে পারি? তারও সামাধান খুঁজে পাওয়া গেছে, আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে আমাদের দেহকোষে এমন কয়েকটি অংশ রয়েছে যারা আবিকৃত অবস্থায় বাবা মা থেকে সন্তানের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

> মেয়েদের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডি.এন.এ মা থেকে সন্তানে প্রবাহিত হয় কোন পরিবর্তন ছাড়াই, আবার ওদিকে ছেলেদের যে 'Y' ক্রোমোজোম টি রয়েছে তাও বাবা থেকে ছেলের মধ্যে অপরিবর্তিত অবস্থায় সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ, এই মাইটোকন্ড্রিয়াল ডি.এন.এ এবং 'Y' ক্রোমোসোমের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আমাদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে ঘটা মিউটেশনগুলোর ঐতিহাসিক তথ্য।

বিজ্ঞানীরা এদের ভিতরকার জেনেটিক মার্কারগুলোর সময়সীমা এবং সংখ্যার আপেক্ষিক পর্যালোচনা থেকেই মোটামুটিভাবে বলতে পারেন কখন কোন জনপুঞ্জ কার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল।

নীচে একজন আদি আমেরিকাবাসী অর্থাৎ আমেরিকান ইন্ডিয়ানের 'Y' ক্রোমোসোমের ভিতরের মিউটেশনগুলো থেকে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস বের করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এখানে তার ডিএনএর ভিতরের বিভিন্ন সময়ে ঘটা মিউটেশনগুলোকে চারটি স্তরে ভেঙ্গে ক্রমানুযায়ী দেখানো হয়েছে। আদি আফ্রিকাবাসীসহ পৃথিবীর সব পুরুষের ডিএনএ তেই একটি বেসিক মিউটেশনের প্যাটার্ণ লক্ষ্য করা যায়, যা আমাদের সামনে আজও আফ্রিকার আদি চিহ্ন বহন করে চলেছে। ১ নম্বর ডিএনএর ছবিতে এই মৌলিক প্যাটার্ণটা দেখানো হয়েছে। ২ নম্বর ডিএনএ তে ৫০ হাজার বছরের পুরনো M168 মিউটেশন বা নির্দেশকটি দেখা যাচ্ছে, যা শুধু আফ্রিকাবাসী পুরুষ ছাড়া পৃথিবীর বাকি সব পুরুষের মধ্যে দেখা যায়, এ থেকে বোঝা যায় যে আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে পড়ার পরপরই সেই জনগোষ্ঠির মধ্যে এই মিউটেশনটা

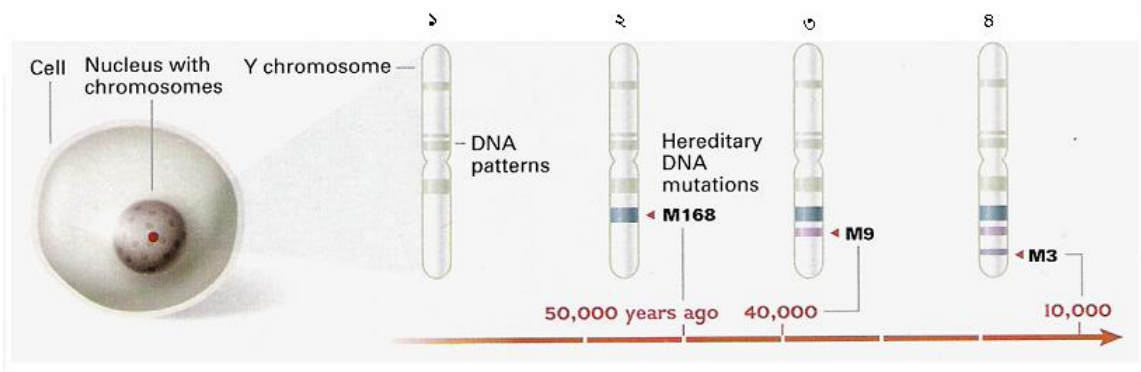

চিত্রঃ ৯.২২: একজন আদি আমেরিকাবাসীর 'Y' ক্রোমোসোমের ভিতরের বিভিন্ন সময়ে ঘটা মিউটেশনগুলো

ঘটেছিল। ৩ নম্বর ডিএনএ তে দেখা যাচ্ছে যে ৪০ হাজার বছরের পুরনো M9 নামে একটি নতুন মিউটেশন যুক্ত হয়েছে, আর এটি শুধু মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্যে এশিয়ার জনগোষ্ঠির মধ্যে দেখা যায়। এর পরে ৪ নম্বর ছবিতে যে M9 (১০ হাজার বছরের পুরনো) নামে যে মিউটেশনটি দেখান হয়েছে তা আজকের আদিবাসী আমেরিকানদের মধ্যে দেখা যায়, আর দেখা যায় এশিয়ার সায়বেরিয়া অঞ্চলের জনগোষ্ঠির মধ্যে যাদেরই একটি অংশ আলাস্কা হয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছিল[২১]।

জেনেটিক তথ্য থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে ৫০-৭০ হাজার বছর আগে যে আফ্রিকাবাসীদের যে ছোট একটি অংশ বের হয়ে এসেছিল তারা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব দিকে এশিয়ার উপকুল ধরে যাত্রা করে তারা কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যাত্রাপথের বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি এবং অস্ট্রেলিয়ায় এখনও যে আদিবাসীরা রয়ে গেছেন তাদের মাইট্রোকন্ড্রিয়াল ডিএনএর মধ্যে এখনও সেই আদি আফ্রিকার নির্দেশকগুলোর চিহ্ন রয়ে গেছে। আর এদিকে ইউরোপে আধুনিক মানুষের খুটি গাড়ার কাহিনীতো আরও রোমাঞ্চকর। এতদিন পর্যন্ত ফসিলবিদেরা মনে করে এসেছেন যে, মানুষের পূর্বপুরুষেরা সম্ভবত আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ইউরোপে বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু জেনেটিক তথ্য তো বলছে আরেক কথা! জেনেটিক নির্দেশক থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশবাসীদের সাথেই বরং ইউরোপবাসীদের বংশগতীয় সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশী। তাহলে কি ভারত থেকে পরবর্তীকালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছিল? ওদিকে ৪০ হাজার বছর আগেই তারা মধ্য এশিয়ার চীনসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পরেছিল। আমরা আগেই দেখেছি, উত্তর এশিয়ার সাইবেরিয়া থেকে ১৫-২০ হাজার বছর আগেই মানুষ উত্তর আমেরিকায় পা রেখেছিল।

আসলে আধুনিক জেনেটিক আবিষ্কারগুলো নিয়ে লিখতে বসলে কলম থামানো খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। মাত্রাতিরিক্ত তথ্যভারে পাঠকেরা বিরক্ত হয়ে থাকলে আশা করি নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন। যাই হোক, আফ্রিকা থেকে বহির্গমনের গল্পের এখানেই ইতি টানছি। এই দু'টো প্রধান বহির্গমন তত্ত্বকে মোটামুটিভাবে সব বিজ্ঞানীই সঠিক বলে মনে করেন। তবে অনেকে মনে করেন যে, এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির ছোট বা বড় অংশ হয়তো আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়েছিল [১১]। একবার বা দু'বার নয় বারবার আফ্রিকা থেকে বেড়িয়ে পড়া এবং তারপর কখনও কখনও আবার পড়ে সেখানে ফিরে যাওয়াও হয়তো এমন কোন অসম্ভব ঘটনা নয়।

মানুষের গল্পটা কি শেষ পর্যন্ত শেষ হল?

না, হল না কিন্তু। গল্পটা ফুরোতে গিয়েও ফুরোয় না, কারণ এ গল্প তো এত তাড়াতাড়ি শেষ হবার নয়। এখনও আরও একটা খুব বড় অংশই বাকি রয়ে গেছে, মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের আরেক অধ্যায় - তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তন, বৌদ্ধিক বিকাশ, ভাষার উৎপত্তি, কৃষিব্যবস্থার উদ্ভব, সভ্যতার সৃষ্টির মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। এই বিষয়গুলো একটু গোলমেলে তো বটেই, এদের কোনটাকেই ফসিলে পুড়ে ইতিহাসের পাতায় বন্দী করা যায় না, শরীরের হাড়গোর, দাঁত না হয় ফসিলে পরিণত হয়, কিন্তু ভাষা, গান, আচার ব্যবহার বা বুদ্ধিচর্চার মত সুকোমল বৃত্তিগুলোর তো আর ফসিল হয় না! কিন্তু এদের সাথে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসটা আবার জড়িয়ে গেছে ওতপ্রোতভাবে। তাই বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, দার্শনিকেরা বিভিন্ন ধরণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অনুকল্প দিয়েছে, এখন সেটা নিয়ে লিখতে গেলে আবার আর এক মহাভারত হয়ে যাবে। এমনিতেই এই অধ্যায়টি অনেক বড় হয়ে গেছে, তাই ভাবছি পাঠকের বিরক্তির পরিমাণ আর না বাড়িয়ে আলাদাভাবে এর পরের অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বিবর্তনের মেলায় নিজেদের সাফল্য, বিকাশ এবং এগিয়ে চলার গল্প দিয়ে বইটার উপসংহার টানলে বোধ হয় মন্দ হবে না।

তথ্যসুত্র

১. DiChristine M, 2006, Becoming Human, Scientific American Science Magazne:Special Edition, p.1.

২. Calvin W. 2006, The Emergence of Intelligence, Scientific American:Special Edition, pp 85.

৩. Gould, S, J: Understanding Evolution, PBS Website.
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/08/1/l_081_06.html

৪. ইসলাম, শ, ২০০৫, বিজ্ঞানের দর্শন, প্রথম খন্ড, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ঢাকা, পৃঃ ৭৯।

৫. Skybreak, A. 2006, The Science of Evolution and The Myth Of Creationism, Insight Press, Illinois, USA.

৬. আখতারুজ্জামান, ম, ২০০৪, বিবর্তনবিদ্যা, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, পৃঃ ২৭৭-৩৭৫।

৭. Wilson, E, 2004, On Human Nature, Presidents and Fellows of Harvard College, p 169

৮. Stringer, C and Andrews, P, 2005, The complete Wrold of Human Evolution, Thames and Hudson Ltd, London.

and

৯.Blow to Neanderthal breeding theory,2003, BBC Science News
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3023685.stm

and

Neanderthals 'not close family, 2004, BBC Science News
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3431609.stm

১০)The Human Origins Progam Resource Guide to Paleoanthropology, Smithsonian National Museum of Natural History

http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/faq/encarta/encarta.htm

১১) Dawkins R, 2004, The Ancestor's Tale, 2004. Houghton Mifflin Company, Boston, New York.

১২)The Human Genome Project,

http://genome.wellcome.ac.uk/node30075.html

১৩) New Genome Comparison Finds Chimps, Humans Very Similar At DNA Level,2005, Science Daily Magazine.

http://www.sciencedaily.com/releases/2005/09/050901074102.htm

১৪) Human and Chimp Genomes Reveal New Twist on Origin of Species, 2006, Science Daily Magazine.

http://www.sciencedaily.com/releases/2006/05/060518075823.htm

১৫) The Human Genome: Quick Facts
http://genome.wellcome.ac.uk/doc_WTD020745.html

১৬) Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium ,2005. "Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome". Nature *437: 69-87.*

http://www.genome.gov/Pages/Research/DIR/Chimp_Analysis.pdf

Kenneth R. Miller, professor of biology at Brown University, delivered the keynote address at the University's 242nd Opening Convocation Tuesday, Sept. 6, 2005.
http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2005-06/05-013m.html

National Human Genome Reserach Institue4, 2005, 'Scientists Analyze Chromosomes 2'

http://www.genome.gov/13514624

১৯) Robotics show Lucy walked upright , 2005, BBC News

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4697977.stm

১৮) Early Human Phylogeny Tree, Smithsonian National Museum of Natural History
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/a_tree.html

১৯) Mayr E, 2004, What Evolution Is,Basic Books, NY, USA. pp 231-268

২০) Food For Thought - 3 Million Years Ago, BBC: Science and Nature:PreHistoric Life.
http://www.bbc.co.uk/sn/prehistoric_life/human/human_evolution/food_for_thought1.shtml

২১) The greatest Journey, 2006, National Geographic Magazine.